নীলমাছি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

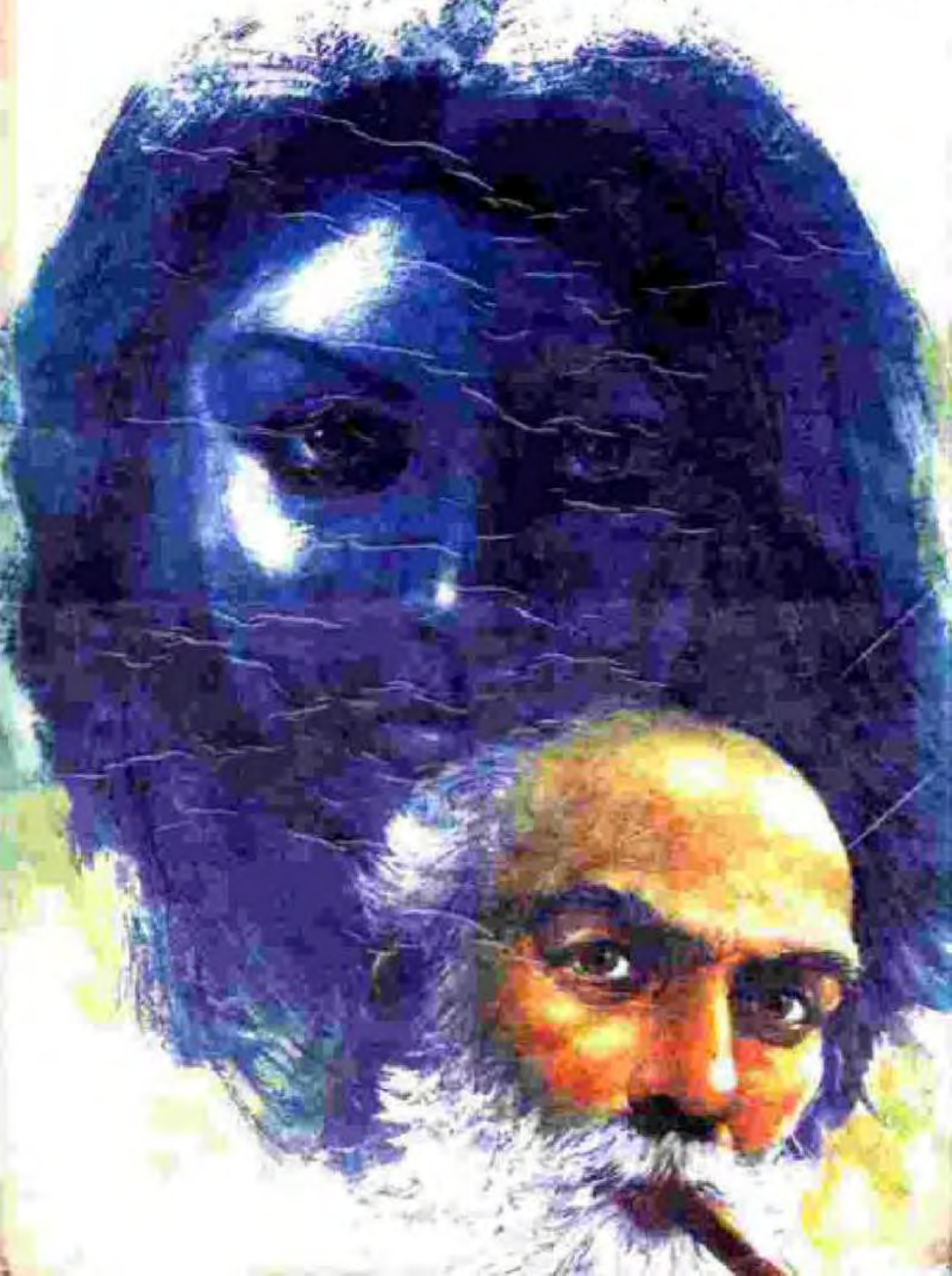

কারও পদবি 'ডাঁশ' হতে পারে ভাবা যায় না। কিন্তু কোন চণ্ডীহাটির কিশোরীমোহন ডাঁশ বাঁকা হেসে নিজের পদবি সম্পর্কে পরিহাসের ছলে বলছিলেন—গ্রামাঞ্চলে ডাঁশ একরকমের মাছি। নীল রঙের মোটা মাছি। গরুমোষের গায়ে বসলে তারা খুঁটি উপড়ে লম্ফঝম্প করে। এ এক সাংঘাতিক মাছি স্যার। ছোটবেলায় ডাঁশ ধরে কুকুরের গায়ে ছেড়ে দিতাম। ওঃ! বেচারার তখন সে কী অবস্থা! জলে ঝাঁপ দিয়েও রেহাই পেত না। তো আমি সেই ডাঁশ। কারও গায়ে একবার সেঁটে বসলে বিষের জ্বালায় তাকে পাগল করে দিতে পারি। তা হলে বলবেন, আপনার কাছে এলাম কেন? এলাম শুধু একটি কারণে—লোকটার পরিচয় পাচ্ছি না। গত তিন মাস ধরে বজ্জাতটা আমাকে উড়ো চিঠি লিখে শাসাচ্ছে। পুলিশের কাছে অনেকবার গিয়েছি। কাজ হয়নি। তারপর এই চরমপত্র!

কিশোরীবাবু জোরে শ্বাস ফেললেন। কর্নেল নিবিষ্ট মনে যথারীতি আতস কাচ দিয়ে একটা চিঠি পড়ছিলেন। এবার আতস কাচটা টেবিলে রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন এবং চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন। কামড়ে ধরা জ্বলন্ত চুরুট থেকে নীল ধোঁয়া তাঁর চওড়া টাক ছুঁয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আড়চোখে দেখলাম, প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে আগন্তুককে দেখছেন। ঈষৎ উত্তেজনাও তাঁর গোঁফের ডগায় ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তিনি অভ্যাসমতো চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত ঘষছেন।

নভেম্বরের এই সকালে কর্নেলের ড্রয়িংরুমে ফ্যান ঘুরছে। কলকাতায় এখনও ভ্যাপসা গরম। কর্নেলের কাছে রবিবারের আড্ডায় এসে দেখেছিলাম হালদারমশাই হাজির। সন্দেহ হয়েছিল প্রাক্তন পুলিশ অফিসার কোনও জটিল রহস্যে ঠাসা কেস হাতে পেয়ে 'কর্নেলস্যার'-এর সাহায্য নিতে এসেছেন। কিন্তু তাঁকে কোনও প্রশ্ন করার আগেই এই ডাঁশ ভদ্রলোক এসে পড়েছিলেন।

ভদ্রলোকের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। চুল আর পুষ্ট গোঁফ কর্নেলের মতো সাদা। বেশ শক্তসমর্থ গড়ন। পরনে প্যান্ট-শার্ট এবং বুকখোলা হাতকাটা সোয়েটার। বোঝা যায়, কলকাতার আবহাওয়া যা-ই হোক, তাঁদের চণ্ডীহাটিতে ঠিক সময়ে শীত এসে গিয়েছে। ভদ্রলোক কিন্তু গেঁয়ো নন। স্মার্ট আধুনিক মানুষ।

ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে গোয়েন্দাপ্রবর অর্থাৎ হালদারমশাই এবার বললেন—কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিগাই।

কিশোরীবাবু ইতিমধ্যে কর্নেলের কাছে আমাদের দুজনের পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি বললেন—মনে করার কী আছে? একটা কেন, একশোটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

—ডাঁশেরে নীল মাছি কইলেন। কিন্তু এমন পদবি কখনও শুনি নাই। ডাঁশ পদবি হইল ক্যান?

কর্নেল চোখ বুজে ছিলেন। খুললেন না। দাঁতের ফাঁকে বললেন—পদবির সঙ্গে কাস্ট্ বা জাতির সম্পর্ক নেই হালদারমশাই।

কিশোরীবাবুকে এখন গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন—আমরা উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, তাঁর ঠাকুরদা সাহেবগঞ্জ এলাকায় রেশমকুঠির মালিক এক ইংরেজের ম্যানেজার ছিলেন। সেই কুঠিয়াল সায়েবই নাকি দাশ পদবিকে 'ডাঁশ' উচ্চারণ করতেন। তারপর থেকে লোকের মুখে মুখে আমরা বংশপরম্পরায় ডাঁশ হয়ে গিয়েছি। অবশ্যি এর সত্যি-মিথ্যে আমি জানি না। তবে সেই সায়েব নিশ্চয় ডাশ বলতেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ একটু হাসলেন।—হঃ! লোকেরা ডাশেরে ডাঁশ কইর‍্যা ফেলছে! কিন্তু আপনারা দাশ পদবি ছাড়ছিলেন ক্যান? লোকেরা জোক করতে পারে। আপনারা লোকের কথায় পদবি চেঞ্জ করছিলেন। এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হইল না।

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। আধপোড়া চুরুট অ্যাশট্রেতে রেখে বললেন—হালদারমশাই! ইংরেজ আমলে বসু বোস হয়েছিল। বাঁড়ুয্যে হয়েছিল ব্যানার্জি—কখনও বোনার্জি। রায় হয়েছিল রে। ঠাকুর ট্যাগোর। সবাই মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই দাশ ডাঁশ হয়ে গেলে সে-আমলে মেনে নিতে দ্বিধা না থাকাই সম্ভব। যাই হোক, কাজের কথায় আসি। কিশোরীবাবু! আপনি এই চিঠিটাকে চরম পত্র বলছিলেন। হ্যাঁ, এটা তাই বটে। লোকটা—আশ্চর্য! কেন আপনার প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তিনমাস ধরে চিঠি লিখছে এবং কেনই বা সে আগামী বুধবার রাত তিনটে চল্লিশে আপনাকে মেরে ফেলবে লিখেছে? একটা কারণ তো থাকা উচিত।

হালদারমশাই সিধে হয়ে বসে বলে উঠলেন—অ্যাঁঃ? কন কী? রাত্র তিনটা চল্লিশ মিনিটে! এক্কেরে টাইমও ঠিক করছে। পাগলের কারবার! এক্কেরে পাগল! কেউ জোক করতাছে। সিওর!

কিশোরীবাবু বললেন—না মিঃ হালদার! এটা জোক নয়। আমি প্রাণের দায়ে ছুটে এসেছি কর্নেলসায়েবের কাছে। আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানেন না। তাই জোক বলছেন।

গোয়েন্দপ্রবর প্রশ্ন করতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন। কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে

বললেন—এ পর্যন্ত আপনি এইটে বাদ দিয়ে মোট পাঁচটা উড়ো চিঠি পেয়েছেন। সেই পাঁচটা চিঠির হস্তাক্ষরের সঙ্গে এই শেষের চিঠির হস্তাক্ষর মিলছে না!

কিশোরীবাবু একটু চমকে উঠলেন।—মিলছে না? কিন্তু আমার তো মনে হয়েছে একজনেরই লেখা।

—না। প্রথম পাঁচটা চিঠিতে বানান ভুল আছে। হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় লোকটা অর্ধশিক্ষিত। শেষ চিঠিটা কোনও শিক্ষিত লোকের লেখা।

কিশোরীমোহন ডাঁশ একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—আমার সন্দেহ, এই পাঁচটা চিঠি কোনও মেয়েকে দিয়ে লেখানো হয়েছে। তারপর আমার অজানা কোনও শত্রু নিজের হাতে চরমপত্রটা লিখে পাঠিয়েছে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ উত্তেজনা দমন করতে পারলেন না। বলে উঠলেন—ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী? ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী? কর্নেল তাঁকে আস্তে বললেন—পরে শুনবেন। আচ্ছা কিশোরীবাবু, এবার সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আপনার স্ত্রী রমলা দেবীকে কেউ খুন করেছিল বলে এতদিনে আপনার ধরণা হয়েছে কেন?

—নিছক ধারণা নয় কর্নেলসায়েব! আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে।

—অথচ তাঁর আত্মহত্যা সাব্যস্ত করেছিল পুলিশ। আপনিও তখন আত্মহত্যা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

—নিয়েছিলাম। তার কারণ তো আপনাকে বলেছি। রমলা আমাকে ভুল বুঝেছিল। রমেন বোসের সেই রক্ষিতা বাইজি কুসুমের প্রেমে পড়েছি বলে সে সন্দেহ করেছিল। তবে দেখুন, সে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের ঘটনা। হঠাৎ পর-পর তিনটে উড়ো চিঠি পাওয়ার পর আমার মনে পড়েছিল, রমলা রমেন বোসকে একদিন প্রকাশ্যে শাসিয়েছিল। রমলার দাদা শান্তনু ছিল ডানপিটে লোক। তাকে সবাই সমীহ করে চলত।

—তিনি কোথায় থাকতেন?

—সাহেবগঞ্জে। আমার শ্বশুরবাড়ি সেখানে—আপনাকে বলা দরকার কথাটা। তো রমলা সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে গোপনে বেরিয়ে চণ্ডীহাটি স্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়েছিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু রমলাকে কেউ খুন করেছে এ বিশ্বাসের যুক্তি কী?

কিশোরীবাবু চাপাস্বরে বললেন—কুসুম বাইজি এখন আর যুবতী নয়। রমেন বোস তাকে দু' বছর আগে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর কুসুম আমার কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছিল। বলতে দ্বিধা নেই; তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম।

—এখনও কি সে আপনার আশ্রয়ে আছে?

—আছে। কিশোরীবাবু জোরে শ্বাস ছাড়লেন।—তো উড়ো চিঠি পাওয়ার পর

কথাপ্রসঙ্গে কুসুমের কাছে জানতে পেরেছিলাম, সেই সন্ধ্যায় রমেন বোস টর্চ হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রমেনের চাকর নন্দ কুসুমের অনুগত ছিল। কুসুমের চর বলতে পারেন। নন্দ তার মনিবকে স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছিল। তার আগে নন্দ রমলাকেও স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছে। তারপর ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই রমলাকে রমেন ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

আবার জোরে শ্বাস ছেড়ে কিশোরীবাবু বললেন—আমার যুক্তিটা কী জানতে চাইছিলেন কর্নেলসায়েব। আমি একটা আঁক কষেছি। রমলা সায়েবগঞ্জে তার দাদাকে ডেকে আনতে যাচ্ছে ভেবে রমেন তাকে ফলো করেছিল। তারপর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের সামনে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। তখন স্টেশনে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। কেরোসিন বাতি জ্বলত। কাজেই ব্যাপারটা কারও ওই মুহূর্তে চোখে না পড়ারই কথা।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন—যুক্তিটা ফেলনা নয়। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার মাথায় কিছু প্রশ্ন জাগছে।

—বলুন!

—কুসুমের কথা শোনার পর এতদিনে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, রমেন বোস প্রাণভয়ে রমলাকে চিরকালের মতো চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তো এই সূত্রেই কি আপনার ধারণা রমেন বোসই আপনাকে উড়ো চিঠি লিখে শাসাচ্ছেন এবং চরমপত্র দিয়েছেন?

—কর্নেলসায়েব! আমি কন্ট্রাকটারি করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি। লেখাপড়ায় আমার একটা ডিগ্রিও আছে। একসময় খনিতে ম্যানেজার ছিলাম। প্লিজ আমাকে তত মূর্খ ভাববেন না। তবে হ্যাঁ—প্রাণের ভয় আমার আছে। নিজের জীবনকে আমি মূল্যবান মনে করি। কবে থেকে জানেন? রমলার মৃত্যুর পর থেকে। সে যাই হোক, রমেনের সঙ্গে আমার শত্রুতার তো কোনও কারণ ছিল না। উড়ো চিঠিগুলো কে লিখছে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে অন্তত চারজনকে সন্দেহের লিস্টে রেখেছি। আপনাকে লিস্টটা দিয়েছি। এবার আপনি আমাকে বাঁচান। অবিনাশদা আপনার পরিচিত। তাঁর কথায় আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

কর্নেল তাঁর সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বললেন—আপনার লিস্টের এক নম্বরে রমেন বোসকে রেখেছেন! কেন?

—জানি না। লিস্টটা আমি খেয়ালবশে করেছি।

—এও আশ্চর্য, আপনার লিস্টের শেষ নম্বরে আছে আপনারই আশ্রিতা কুসুমকুমারী দাসী!

কিশোরীমোহন ডাঁশ বিব্রতভাবে মাথা নেড়ে বললেন—আমি জানি না। আমার কলমের ডগা দিয়ে চারটে নাম বেরিয়ে এসেছে। কেন এসেছে, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে আভাসটুকু দিয়েছি।

কর্নেল তাঁর কথার উপর বললেন—আপনি কি সবসময় ফায়ার আর্মস সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন?

—হ্যাঁ। মৃত্যুভয় আমাকে পাগল করে ফেলেছে। আমি এবার উঠছি কর্নেলসায়েব! আপনি আমার একমাত্র ভরসা।

কিশোরীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে দেখলাম, তাঁর দু'পায়ের ফাঁকে একটা কালো ব্রিফকেস ছিল। সেটা হাতে নিয়ে তিনি হালদারমশাইকে বললেন—আপনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার সাহায্যও আমি চাইছি। কর্নেলসায়েব কোনও ফি নেন না। আপনার প্রফেশনের কথা ভেবে আমি আপনাকে ফি দিতে চাই।

তিনি পার্স বের করতেই গোয়ন্দাপ্রবর বললেন—পরে। পরে। চিন্তা করবেন না। আইজ হইল গিয়া রবিবার আগামী বুধবার রাত্র পার হইলে আমারে যা দিতে ইচ্ছা হয় দিবেন।

কিশোরীমোহন ডাঁশ দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। কে জানে কেন আমার মনে হলো ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গিতে মৃত্যুভয়ের চেয়ে বরং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অন্ধ উন্মাদনা আছে।

কর্নেলকে কথাটা বলতে যাচ্ছি, হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন—কর্নেলস্যার! ওনারে ফলো করুম?

কর্নেল বললেন—কেন? ওঁকে বললেই আপনি ওঁর সঙ্গী হতে পারতেন! আপনাকে উনি আগাম ফি দিতে চাইছিলেন! আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শুনে উনি আপনার সাহায্যও তো চান।

অমনি গোয়েন্দাপ্রবর তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন।—তা হইলে যাই গিয়া। বলে তিনি যথারীতি সবেগে প্রস্থান করলেন।

হালদারমশাইয়ের জেদি ও হঠকারী স্বভাবের কথা জানি। তাই অবাক হলাম না। হাসি পেল। বললাম—কাজটা ঠিক করলেন না কর্নেল! হালদারমশাই কেলেংকারি বাধিয়ে ছাড়বেন। এ কেসের ব্যাকগ্রাউন্ড কি উনি পুরোটা জানেন?

—ব্যাকগ্রাউন্ডটা উনি মোটামুটি জেনেছেন বৈকি!

—আমি যতটা জেনেছি, উনিও ততটা। তা থেকে আমি কোনও পরিষ্কার ছবি পাইনি।

—ডার্লিং! তুমি সাংবাদিক। আর হালদারমশাই অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে উনি রিটায়ার করেছিলেন, এ কথা ভুলে যেয়ো না! যাই হোক! আরেক দফা কফি দরকার। বলে কর্নেল হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী! কফি...

কিছুক্ষণ পরে কফি পান করতে করতে বললাম—উড়ো চিঠিগুলো আমাকে দেখাতে আপত্তি না থাকলে দেখান। কে জানে কেন ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে। কিশোরীবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে আমার মনে হয়েছে, মৃত্যুভয়ে নয়—যেন কোনও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য উনি ব্যগ্র।

কর্নেল আমার কথার উত্তরে কিছু বললেন না। 'চরমপত্র' যেটা, সেটা ওঁর বুকপকেটে ছিল। বের করে আমাকে দিলেন তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে বাকি পাঁচটা চিঠি বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

চরমপত্রটা যে কাগজে লেখা, সেটা ম্যাপলিথো কাগজ এবং ময়লা। অর্থাৎ পুরনো। কাগজটা টেনে ছেঁড়া। ওপরদিকটা বাঁকা। বাঁদিকটা সোজা। লাল ডটপেনে তাতে লেখা আছে ঃ

তৈরী থেকো। এটা চরমপত্র। আগামী বুধবার রাত্রি ৩-৪০ মিনিটে তোমার মৃত্যু। এই মৃত্যু অনিবার্য। পুলিশ কেন, স্বয়ং ঈশ্বরও তোমার মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না।

বাকি পাঁচটা চিঠি সম্ভবত রুলটানা ডায়রিবই থেকে নানা সাইজে ছিঁড়ে নেওয়া কাগজে লেখা। প্রত্যেকটি চিঠি লাল ডটপেনে লেখা। কথা মোটামুটি একই রকমের ঃ তোমার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু একেকটা চিঠিতে আনুষঙ্গিক কিছু কথা যোগ করা হয়েছে। আঁকাবাঁকা হরফ। বানান ভুল। যেমন 'শিঘ্র', 'মিত্যু', 'পাণ' (প্রাণ), 'পরাচিত্ত' (প্রায়শ্চিত্ত) ইত্যাদি।

বললাম—এখানে একটা শব্দ পাচ্ছি। সম্ভবত 'প্রায়শ্চিত্ত'। তা হলে তো দেখা যাচ্ছে কিশোরীবাবুকে কেউ প্রতিশোধবশত খুন করতে চায়। কিশোরীবাবুর কী বক্তব্য?

কর্নেল বললেন—উনি বলেছেন, জ্ঞানত কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করেননি। কাজেই কথাটা হয়তো প্রায়শ্চিত্ত নয়। অন্য কিছু। গ্রামাঞ্চলে প্রায়শ্চিত্তকে অশিক্ষিত লোকেরা 'পরাচিত্তির' বলে শুনেছি। কিশোরীবাবু জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি জীবনে এমন কিছু করেননি, যাতে তাঁকে 'পরাচিত্তির' করতে হবে। তবে লক্ষ্য করো, লাইনটাতে প্রায়শ্চিত্ত শব্দ খাপ খায় না। পড়ো একবার।

পড়লাম লাইনটা।—'তার পরাচিত্তবলে সেটা হবে মিত্যু।' হ্যাঁ। গোলমেলে কতা। সম্ভবত নেহাত সাক্ষর লোকের লেখা চিঠি। পাঁচটা চিঠিতেই মৃত্যু হয়েছে 'মিত্যু'। আচ্ছা কর্নেল, আপনি বলছিলেন, এগুলো যেন মেয়েলি হাতের লেখা।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কর্নেল হাসলেন।—কিশোরীবাবুও সম্ভবত একই সন্দেহে তাঁর লিস্টের চার নম্বরে তাঁরই আশ্রিতা কুসুমকুমারী দাসীর নাম লিখেছেন!

—বাকি নাম?

—এক নম্বরে রমেন বোস। তুমি নিজেই দেখ।

কর্নেল আবার বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। বাঁধানো স্লিপ থেকে ছেঁড়া কাগজে ইংরেজিতে পরপর চারটে নাম লেখা আছে। কিশোরীবাবুর ইংরেজি হস্তাক্ষর সুন্দর এবং স্মার্ট বলা যায়।

১। রমেন বোস

২। সঞ্জয় সিংহ

৩। রামলোচন ত্রিবেদী

৪। কুমুসকুমারী দাসী

জিজ্ঞেস করলাম—এঁরা কি সবাই চণ্ডীহাটি গ্রামের?

—গ্রাম নয়। সমৃদ্ধ গঞ্জ। সাহেবগঞ্জ থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্ব। রাজমহল পাহাড়ের কাছে গঙ্গার দক্ষিণতীরে এলাকাটা পাহাড়ি। তবে চণ্ডীহাটি সমতল জায়গায় অবস্থিত। হ্যাঁ—লিস্টের সকলেই সেখানকার বাসিন্দা।

—কুসুমকুমারীর পরিচয় পেয়েছি। রমেন বোস সম্ভবত ধনী লোক।

—হ্যাঁ। জমিদারবংশীয় তিনি। সঞ্জয় সিংহ সিনহাসায়েব নামে পরিচিত। ওঁর ট্রান্সপোর্ট কম্পানি আছে। কিশোরীবাবু যখন কন্ট্রাকটারি করতেন, তখন টাকাকড়ির ব্যাপারে সিনহাসায়েবের সঙ্গে মামলা হয়েছিল। আর রামলোচন ত্রিবেদী রাজনীতি করেন। তাঁর পার্টিফান্ডে দাবিমতো টাকা দেননি বলে কিশোরীবাবুর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য আছে। কিন্তু এটা একটা লক্ষ্য করার মতো ঘটনা—চিঠিগুলো ডাকে আসেনি। লেটারবক্সে পাওয়া গিয়েছে।

—এ সব কথা আপনাকে কিশোরীবাবু জানিয়েছেন?

—অবশ্যই। আমি অন্তর্যামী নই জয়ন্ত!

কর্নেল হাসতে হাসতে চুরুট ধরালেন। একটু পরে বললাম—অবিনাশবাবু কে?

—অবিনাশ রায়চৌধুরি। আমার পুরনো বন্ধু। ইনি আদতে কলকাতার মানুষ। চণ্ডীহাটি ওঁর মামাবাড়ি। মামা-মামীর সন্তান ছিল না। ওঁদের সম্পত্তি মিঃ রায়চৌধুরি পেয়েছিলেন। পঁচিশ একর জমির মধ্যে প্রায় অর্ধেকটা বিক্রি করে সেগুন গাছ আর ফুলফলের বাগান করেছেন। মামার বাড়িটা স্কুলের জন্য দান করেছেন।

—তিনি কি তা হলে সেই বাগানবাড়িতে থাকেন? অর্থাৎ ফার্মহাউসে?

—ফার্মহাউস বলতে আপত্তি নেই। তবে সেখানে ওঁর কাঠগোলাও আছে।

এলাকার জঙ্গলের গাছ সরকারের কাছে কিনে করাতকলে চেরাই করেন। তবে আমার মতো বাতিকও আছে।

—পাখি প্রজাপতি অর্কিড নয় তো?

—মাই গুডনেস! হঠাৎ কর্নেল নড়ে বসলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা নোটবই বের করে পাতা উল্টে দেখে বললেন—'ডেনড্রোবিয়াম ক্রিস্টক্সাম!'

অবাক হয়ে বললাম—তার মানে?

—অর্কিড জয়ন্ত, অর্কিড! অরুণাচল থেকে অবিনাশবাবু তা এনে চাষ করেছেন। ভুলেই গিয়েছিলাম, নভেম্বরে এর ফুল ফোটে। ডার্লিং! ডেনড্রোবিয়াম ক্রিস্টক্সাম-এর 'লিঙল' প্রজাতির ফুল দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

দুই

রাত সওয়া আটটা নাগাদ ট্রেনে চেপেছিলাম। চণ্ডীহাটি পৌঁছুলাম পরদিন সোমবার বেলা সাড়ে নটায়। কর্নেলের পরামর্শে গরম পোশাক-আশাক গায়ে চড়িয়েছিলাম। উত্তরে গঙ্গা। তাই হয়তো এত বেশি হিম। কর্নেল গতকাল ট্রাঙ্ককলে অবিনাশ রায়চৌধুরির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। গেট পেরিয়ে দেখা হয়ে গেল কর্নেলের মতো লম্বাচওড়া এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি কর্নেলের করমর্দন করে সহাস্যে বললেন—ওয়েলকাম কর্নেল সরকার! এই তিন বছরেও আপনার বিশেষ কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ছে না।

কর্নেল বললেন—আপনারও।

—নাঃ! একটা বাজে অসুখে ভুগছি। অনিদ্রা! তাই বলে ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি না। বলে তিনি আমার দিকে হাত বাড়ালেন।—ওয়েলকাম জয়ন্তবাবু! কর্নেল সরকারের মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি। এখানে বাঙালি প্রচুর। কিন্তু বাংলা কাগজ পড়ার লোক নেই। সবাই ইংরেজি কাগজ পড়ে। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা চেষ্টা করেও আনাতে পারিনি।

অবিনাশবাবু গাড়ি এনেছিলেন। নিজেই ড্রাইভ করেন। গাড়িতে কর্নেল তাঁর বাঁপাশে বসলেন। আমি পিছনের সিটে বসলাম। লাগেজ বলতে কর্নেলের একটা স্যুটকেস। আমি জানি, ওর মধ্যে ফোটো ওয়াশ এবং প্রিন্টের ছোট্ট ল্যাব গুটোনো আছে। কোনও বাথরুমই তাঁর ডার্করুম হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেই স্যুটকেস আর আমার একটা মোটাসোটা ব্যাগ ডিকিতে ঢুকে রইল। কর্নেলের কথামতো আমার ফায়ার আর্মস এনেছি। সেটা আমার জ্যাকেটের বাঁদিকের ভেতর পকেটে ঘুমোচ্ছে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে অবিনাশবাবু বললেন—কিশোরীবাবু কাল সন্ধ্যায় ফিরেছেন। ফোনে জানালেন, আপনি তাঁর সঙ্গে আগাম একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে

পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিশোরীবাবুর ব্যাপারটা আমি অবশ্য তত সিরিয়াসলি নিইনি।

কর্নেল বললেন—কেন?

—ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার চেনাজানা অনেক দিনের। কখনও-কখনও মনে হয়েছে সাইকাট্রিক পেশেন্ট।

—সে কী!

—হ্যাঁ। প্রচণ্ড সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। প্রায়ই ফোন করে বলেন, তাঁকে কেউ মার্ডার করার চক্রান্ত করেছে। অবিনাশবাবু হাসলেন।—জানেন? গত জুন মাসে এক বিকেলে আমার কাছে এসেছিলেন। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ওঁকে গেটে পৌঁছে দিতে গেলাম। জিপগাড়িতে চাপতে গিয়ে হঠাৎ কোথায় কী দেখে ফায়ার আর্মস বের করে এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে বসলেন। কাঠগোলার কোনও শ্রমিকের প্রাণ যেত! আমি খাপ্পা হয়ে উঠেছিলাম। কিশোরীবাবু করুণ মুখে বললেন, তাঁর চোখের ভুল। কাঠগোলার কাছে কেউ ওত পেতে বসে আছে মনে হয়েছিল!

—আমাকে বলছিলেন মৃত্যুভয় সব সময় ওঁকে যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে!

—সেইজন্যই বলছি মানসিক রোগে ভুগছেন ভদ্রলোক। ওঁর অতীত জীবন সম্পর্কে চণ্ডীহাটিতে অনেক গুজব আছে। এক বাইজিকে নিয়ে রমেন বোস নামে একজনের সঙ্গে ওঁর প্রচণ্ড লড়াই ছিল। রমেনবাবু হেরে যান। সেই বাইজি পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে কিশোরীবাবু কোথা থেকে এনে বাড়িতে রেখেছেন। এখন সে বিগতযৌবনা বললেই চলে।

—হেলেন অব ট্রয়!

অবিনাশবাবু হেসে উঠলেন।—ঠিক বলেছেন। সুন্দরী যুবতী হেলেনকে উদ্ধার করার পর দেখা যায় তখন তিনি বৃদ্ধা। ট্রাজিক ঘটনা। কিন্তু এটাই হয়তো মানুষের জীবনে ইউনিভার্সাল ট্রুথ। হোমার এই সত্যটা বুঝতে পেরেছিলেন। যেটার জন্য সারাজীবন লড়লাম, জেতার পর দেখলাম সেটা আর আমার কাজে লাগবে না। আমি কিশোরীবাবুর এই ব্যাপারটা ঠিক এমন অ্যাংগ্‌ল্‌ থেকে দেখিনি। কর্নেল সরকার! এজন্যই কলকাতায় আপনার চেনাজানা মহলে আপনার তৃতীয় একটি চোখ আছে বলে গুজব শুনেছিলাম। আপনি সত্যটা দেখতে পেয়েছেন।

—নাঃ! ও কিছু নয়। আপনি ডেনড্রোবিয়াম ক্রিস্টক্‌সাম লিন্ডলের খবর দিন।

—গিয়েই দেখবেন। কমলারঙের ফুলের গুচ্ছ চোখে আগুন ধরিয়ে দেবে। লাল রেখাগুলো যেন রক্তে লেখা প্রকৃতির চিঠি।

বুঝলাম, অবিনাশবাবু কর্নেলের চেয়ে এককাঠি সরেস। কর্নেল প্রকৃতিপ্রেমিক হলেও ততটা ভাবপ্রবণ নন। অন্তত ওই ধরনের কবিত্ব করেন না।

ভিড়ে ভরা বাজার পেরিয়ে গাড়ি সংকীর্ণ লাল রাস্তায় মোড় নিল। চড়াই-

উৎরাই পাহাড়ি রাস্তা। তারপর দু'ধারে টিলা, জঙ্গল, অসমতল রুক্ষ মাঠ পেরিয়ে দক্ষিণে নীলরঙের পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছিল। কিন্তু সেই পাহাড় দূরেই থেকে গেল। বাঁদিকে ঘুরে একটা ছোট্ট নদীর ওপর পাথরের তৈরি পুরনো সেতু পেরিয়ে টিলার গায়ে একটা সুন্দর বাড়ির গেটে পৌঁছল। নিচে একধারে কাঠগোলা। করাতকলের শব্দ ভেসে আসছিল। সেখানে তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। মজুররা তক্তা বোঝাই করছিল।

বাড়ির গেটে ঢুকে লনের একপাশে গাড়ি দাঁড় করালেন অবিনাশবাবু। গেটে বন্দুকধারী দারোয়ান আছে দেখলাম। আমরা নামবার পর দু'জন লোক দৌড়ে এসে সেলাম দিল। অবিনাশবাবু একজনকে বললেন—কী শাকিলমিয়াঁ। কর্নেলসায়েবকে চিনতে পারছ তো?

মধ্যবয়সী প্যান্টশার্টপরা লোকটি তখনই কর্নেলকে সেলাম দিল সামরিক ভঙ্গিতে। বুঝলাম, লোকটি একসময় সামরিক বিভাগে চাকরি করত।

দক্ষিণের টানা বারান্দায় গিয়ে আমরা বসলাম। আমাদের লাগেজ নিয়ে দ্বিতীয় লোকটি পূর্বদিকের একটা ঘরে ঢুকল। শাকিলমিয়াঁ যে বাবুর্চি, তা বুঝতে পারছিলাম। সে সম্ভবত কফি তৈরিই রেখেছিল। শীগগির নিয়ে এল ট্রে-ভর্তি স্ন্যাক্স, কফির পেয়ালা ও পট।

কফিতে চুমুক দিয়ে চাঙ্গা হলাম। এখান থেকে নিচে দক্ষিণে সেগুনের জঙ্গল এবং পশ্চিমে ফুল-ফলের বাগান চোখে পড়ছিল। একটু পরে দেখলাম, কাঁধে বন্দুক নিয়ে একটা লোক মাচানে বসে পাহারা দিচ্ছে। আরেকজন দুটো প্রকাণ্ড কুকুরের মল্লযুদ্ধ কিংবা খেলা উপভোগ করছে।

একটু পরে অবিনাশবাবু ঘরে ঢুকলেন। তখন চাপাস্বরে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম—অবিনাশবাবুর কি এখানে ফ্যামিলি থাকে না?

কর্নেল কফি পান করতে করতে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। বললেন—নাঃ! মিঃ রায়চৌধুরি বিপত্নীক। দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেননি। এই যে এত সব লোকজন দেখছ চারদিকে, তারা নিজের নিজের কাজ করছে। ওরাই ওঁর ফ্যামিলি। মিঃ রায়চৌধুরি তা-ই বলেন।

—চণ্ডীহাটি থেকে জায়গাটা কত দূরে?

—দশ কিলোমিটার। তবে হাঁটা পথে বনবাদাড় ভেঙে হাঁটলে পরে শর্টকাটে পাঁচ।

—আপনি এখানে থেকে কিশোরীবাবুর শত্রু খুঁজে পাবেন? এত দূরে!

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন—ডেনড্রোবিয়ান ক্রিস্টক্সাম লিন্ডল।

কর্নেল কথাটা জোরে উচ্চারণ করেছিলেন। অবিনাশবাবু বেরিয়ে এসে

বললেন—চলুন কর্নেল সরকার! অরুণাচলের অর্কিড বিহারের আবহাওয়ায় কীভাবে আত্মপ্রচার করেছে দেখে অবাক হবেন।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে তাঁর কিটব্যাগটা আমাকে দিয়ে নেমে গেলেন। গলায় বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছিল। হঠাৎ ঘুরে তিনি বললেন—জয়ন্ত! তুমি ততক্ষণ পোশাক বদলে নাও। অর্কিড তোমার সাবজেক্ট নয়।

অবিনাশবাবু ডাকলেন—শিবু! এঁকে গেস্টরুমে নিয়ে যা।

যে লোকটি লাগেজ নিয়ে পূর্বপ্রান্তের ঘরে রেখেছিল, সে এগিয়ে এসে বলল—আসুন সার।

ঘরটা চওড়া এবং সুন্দর সাজানো। দু'ধারে দুটো নিচু খাটে সুদৃশ্য বিছানা পাতা আছে। একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার এবং ইজিচেয়ার আছে। দেওয়াল-আলমারিতে পুতুল আর বই ঠাসা। একটা ফুলদানিতে রঙবেরঙের ফুলের বোকে সাজানো আছে। কর্নেলের কিটব্যাগটা টেবিলে রেখে ইজিচেয়ারে বসলাম।

শিবু বলল—বাথরুমে গিজার আছে সার। গরম জল পাবেন।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি বাঙালি?

—আজ্ঞে।

—বাড়ি কোথায় তোমার?

—চণ্ডীহাটিতে ছিল। এখন সায়েবের বাড়িতেই থাকি।

—কিশোরীবাবুকে চেনো?

শিবু হাসল।—ডাঁশবাবু? খুব চিনি। মাথায় ছিট আছে। কিন্তু দেখলে বোঝা যায় না। শুনেছি ওঁর ওয়াইফ রেললাইনে সুইসাইড করার পর থেকে ওইরকম হয়েছে।

—কী রকম?

—কাকেও বিশ্বাস করেন না। বেশ কথাবার্তা বলছেন—বলতে বলতে হঠাৎ কার ওপর খেপে গিয়ে বলেন, গুলি করে মারব। বাড়িতে সাংঘাতিক একটা কুকুর আছে। সবসময় কুকুরটা ছাড়া থাকে।

—আর কে আছে ওঁর?

শিবু একটু ইতস্তত করে বলল—একটা মেয়েছেলে আছে। শুনেছি বাইজি ছিল। এখন বয়স হয়েছে। কিন্তু এখনও সাজের ঘটা কী! সবসময় মেমসায়েবের মতো ঠোঁটে লিপস্টিক আর—

অবিনাশবাবুর ডাক শোনা গেল—শিবু! এখানে আয়।

কথা শেষ না করে শিবু বেরিয়ে গেল। বুঝলাম কুসুমকুমারী দাসী এখনও পুরনো জীবনকে আঁকড়ে ধরে আছে। কর্নেল বলছিলেন, হেলেন অব ট্রয়! কথাটা

মনে পড়ে হাসি পেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কর্নেল একা ফিরে এলেন। বললাম—অর্কিড দেখলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—যতটা আশা করেছিলাম, তত কিছু নয়। কমলা-হলুদ রঙের জেল্লা নেই। ফিকে হয়ে গেছে। তবে মিঃ রায়চৌধুরির প্রচুর প্রশংসা প্রাপ্য। কারণ গত গ্রীষ্মেও বিহারের প্রচণ্ড তাপ থেকে ওদের বাঁচাতে পেরেছেন। অরুণাচলে গ্রীষ্মকাল বলে কিছু নেই—গাঙ্গেয় উপত্যকার তুলনায়। তবে থাক ওসব কথা। তুমি স্নান করে নাও। আমি একটু ধাতস্থ হয়ে নিই ততক্ষণ।...

ব্রেকফাস্টের পর বারান্দায় বসে কর্নেল আরেক দফা কফিপানে মগ্ন হলেন। অবিনাশবাবু বললেন—তখন শান্তনু সিংহের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। কিশোরীবাবুর এই শ্যালকটির কথা আমি শুনেছিলাম। আমার ফার্মে সাহেবগঞ্জের কয়েকজন মজুর ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। ওদের সর্দার রামলগনকে শান্তনুবাবুর কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম। শুনলাম বছর দশেক আগে পুলিশের গুলিতে উনি মারা গিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, কিশোরীবাবুর তা জানার কথা! ক'দিন আগে ওঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, শ্যালককে বাড়িতে এনে রাখুন। ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বলুন। তাহলে শান্তনুবাবুর ভয়ে আপনার শত্রু যে-ই হোক, টুঁ শব্দটি করবে না। কিশোরীবাবু তখন বললেন, ওঁকে তিনি বিশ্বাস করেন না।

কর্নেল বললেন—শ্যালকের মৃত্যুর খবর জানেন না কিশোরীবাবু?

—তা-ই তো দেখলাম। আশ্চর্য লাগছে এটা। আমাকে মিথ্যা বলার কারণ কী?

—আমি শান্তনুবাবুর কথা জিজ্ঞেস করিনি। কিশোরীবাবু নিজেও বলেননি। কাজেই ধরে নিয়েছিলাম, ওঁর দুর্বর্ষ শ্যালক এখনও বেঁচে আছেন। হয়তো এখন বয়সে বৃদ্ধ। তাই শ্যালকের সাহায্য পাবেন না বলে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছিলেন।

অবিনাশবাবু একটু চুপ করে থাকার পর আস্তে বললেন—কথাটা খুলেই বলি। কিশোরীবাবুকে আমার প্রশ্রয় দেওয়ার কারণ আছে। আমার মামার পঁচিশ একর জমির কিছু অংশ জবরদখল হয়ে গিয়েছিল। ওই পূর্বে যে টিলাটা দেখছেন, তার নিচের মাঠটা পুরো দখল করেছিল রামলোচন ত্রিবেদীর পার্টির কিছু লোক। কিশোরীবাবু ওঁর বিরোধী পার্টির এক নেতা রণবীর প্রসাদকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। প্রসাদজিকে পূর্বদিকের বারো একর জমি বিক্রি করে দিই। উপযুক্ত দাম পাইনি। তবে প্রসাদজি জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করেন। এলাকার নিম্নবর্গীয় মানুষেরা ওঁর পার্টির সমর্থক। জয়ন্তবাবু সাংবাদিক। বিহারের ভূমিসেনাদের কথা শুনে থাকবেন। প্রসাদজি তাদের নেতা।

বললাম—প্রসাদজি কি তাহলে নকশাল মাওবাদী পার্টির নেতা?

কর্নেল হাসলেন।—বিহারে 'যার লাঠি তার মাটি' প্রবাদটা আবার চাগিয়ে উঠেছে।

অবিনাশবাবু বললেন—মাওবাদী নকশাল পাটি কাগজের কথা। যাই হোক, কিশোরীবাবুর কাছে আমি ঋণী। কাজেই তাঁর বিপদে সাহায্য করা আমি কর্তব্য মনে করেছিলাম। কিন্তু রমেন বোস আমাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, তাঁকে বললেই জমি উদ্ধার করে দিতেন। কিশোরীবাবুর সাহায্যে প্রসাদজিকে ডাকা নাকি ঘরে খাল কেটে কুমির ঢোকানো।

কর্নেল বললেন—রমেন বোসের কী অবস্থা এখন?

—চণ্ডীহাটির বাঙালি জমিদারের বংশধর। এখনও রসেবশে আছেন। দানধ্যান করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। ত্রিবেদীর পার্টিকে নিজের বিশাল বাড়ির একটা ঘরে অফিস করতে দিয়েছেন।

—আপনার সঙ্গে রমেনবাবুর সম্পর্ক কেমন?

—সম্পর্ক ভালো। দৈবাৎ চণ্ডীহাটিতে দেখা হলে হাসিমুখে কথাবার্তা বলেন। ত্রিবেদীর পার্টিকে অফিসের ঘর দিলেও নিজে রাজনীতি থেকে গা বাঁচিয়ে চলেন। তবে ধূর্ত লোক। অতবড় বাড়ি আর জমিজায়গা জবরদখল না হয়ে যায়, সেই জন্য ত্রিবেদীর সঙ্গে ভাব রেখেছেন। তবে এ-ও ঠিক প্রসাদজির দলকে বিশ্বাস করা কঠিন।

—সঞ্জয় সিংহকে আপনি নিশ্চয় চেনেন?

অবিনাশবাবু হাসলেন।—কর্নেল সরকার পেপার ওয়ার্ক না করে কোনও কেসে হাত দেন না তা জানি। হ্যাঁ, সিনহাসায়েব আমার পরিচিত। ওঁর সিনহা ট্রান্সপোর্ট কম্পানিই আমাকে ট্রাক যোগান দেয়। কিশোরীবাবু কি ওঁর সম্পর্কে কিছু বলেছেন আপনাকে?

—খুলে কিছু বলেননি। তবে শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন।

—ও হ্যাঁ! মনে পড়েছে। কিশোরীবাবু যখন কন্ট্রাকটারি করতেন, তখন সিনহাসায়েবের ট্রান্সপোর্ট কম্পানির ট্রাক ব্যবহার করতেন। দেনাপাওনা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঝামেলা বেধেছিল। মামলাও হয়েছিল সম্ভবত। কিন্তু সেই পুরনো শত্রুতার জের আর থাকার কথা নয়। নাঃ! সিনহাসায়েব তাঁকে খুনের হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠাবেন এটা অসম্ভব! আসলে কিশোরীবাবু একে ছিটগ্রস্ত, তার ওপর সন্দেহবাতিকে ভুগছেন।

এইসময় শিবু এসে বলল—ফোন এসেছে সার! এক ভদ্রলোক কর্নেলসায়েবকে ডেকে দিতে বললেন।

অবিনাশবাবু বললেন—কর্নেলসায়েব ফোন ধরতে যাচ্ছেন। তুই এক কাজ কর শিবু। এই খামটা কাঠগোলায় দিয়ে আয়। সাইকেলে চেপে শীগগির যা। একেবারে ভুলে গেছি। ফোনের কথায় মনে পড়ে গেল। শোন! খামটা মন্টুবাবুকে দিবি। অন্য কাকেও নয়।

তিনি বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা একটা লম্বা খাম শিবুকে দিলেন। শিবু হন্তদন্ত চলে গেল। আমি বললাম—আপনার একটা সেগুন গাছের বন আছে শুনেছি। কোথায় সেটা?

—সেগুনবাগিচা বলুন! অবিনাশবাবু দক্ষিণে দূরে কুয়াশাঢাকা একটা জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে বললেন—আগের দিনে বর্মার সেগুনকাঠ 'বর্মা টিক' নামে বিখ্যাত ছিল। বর্মা থেকে চারা এনে এই সেগুনবাগিচা তৈরি করেছি। এ অঞ্চলের সেগুনের মতো নয়। দেখা যাক, বর্মা টিকের খ্যাতি ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা। আর পাঁচ বছর পরে একটা গাছ কেটে পরীক্ষা করার সুযোগ পাব।

অবিনাশ রায়চৌধুরির কীর্তিকলাপ দেখে অবাক লাগছিল। বাঙালি সম্পর্কে অনেক বাজে গুজব আছে। অথচ বাঙালি যুগে যুগে দেশে-বিদেশে কত বিচিত্র কাজকর্মই না করেছে। কত অ্যাডভেঞ্চার, কত দুঃসাহসিক কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাঙালি, তার অনেক প্রমাণ এ যাবৎ পেয়েছি। এবার চোখের সামনে আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখছি। অবিনাশবাবু একজন প্রকৃত অ্যাডভেঞ্চারার।

এই দুর্গম স্থানে একা তিনি এতবড় একটা প্ল্যান্টেশন ফার্ম আর কাঠগোলা চালাচ্ছেন। এসব নিয়ে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় সচিত্র ফিচার লিখতে হবে। এই ভেবে তাঁকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ উনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন সামনে সংকীর্ণ একটা উৎরাই বেয়ে। এভাবে কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না।

সেই সময় কর্নেল ফিরে এলেন। বললাম—কার ফোন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—হালদারমশাইয়ের।

—কী বললেন উনি?

—কুসুমকুমারী দাসীর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। মহিলা নাকি মোটেও বুড়ি নন। যৌবনে পরমাসুন্দরী ছিলেন, তার ছাপ এখনও চোখে পড়ে।

—সর্বনাশ! হালদারমশাই ওঁর প্রেমে পড়েননি তো?

কর্নেল আবার হাসলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন—কুসুমকুমারীর পাশের ঘরে আছেন হালদারমশাই। এদিকে এক সমস্যা। কিশোরবাবুর টেরিয়ার কুকুরটা দিনরাত ছাড়া থাকে। বারান্দায় গ্রিল আছে—সেই রক্ষা। আর একটা খবর, আজ সকালে কিশোরীবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাড়ির কাজের লোক

হরগোবিন্দ টেলিফোনে ডাক্তার ডেকেছিল। ডাক্তারবাবু পনের মিনিটের মধ্যে এসেছিলেন। আশ্চর্য! কুকুরটা তাঁকে কিছু বলেনি। এ থেকে হালদারমশাইয়ের সিদ্ধান্ত, কিশোরীবাবুর নানারকম অসুখ আছে এবং ডাক্তারবাবু প্রায়ই আসেন।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে ফের বললেন—কুসুমকুমারীর সঙ্গে ডাক্তারবাবু ঠাট্টাতামাশা করছিলেন। হালদারমশাইয়ের ধারণা, ডাক্তারবাবু একসময় ওই মহিলার অন্যতম প্রেমিক ছিলেন।

কর্নেল চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন। একটু পরে বললাম—আর কিছু?

—ডাক্তারবাবু হালদারমশাইয়ের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। কুসুম বলেছে, তার দূরসম্পর্কের দাদা। কুসুমের জন্ম নাকি পূর্ববঙ্গে। এঘাটে-ওঘাটে ঘুরতে ঘুরতে লখনৌয়ে বাইজিমহলে ঠাঁই পেয়েছিল। সেখান থেকে চণ্ডীহাটি এসেছিল রমেনবাবুর সঙ্গে। এতকাল পরে তার দাদা খোঁজ পেয়ে ছুটে এসেছে। তাকে কলকাতা নিয়ে যাবে।

—কুসুমকুমারী অভিনয়েও পটু মনে হচ্ছে।

—মনে হচ্ছে কী বলছ? হালদারমশাই জানতে পেরেছেন, জমিদারবাড়ির থিয়েটারে সে অভিনয় করত। ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাটও সেই থিয়েটারে অভিনয় করতেন।

—ডাক্তারের নাম চিত্তরঞ্জন বরাট?

—হ্যাঁ। হালদারমশাই বললেন, আমরা যেন আজ বিকেলে ও-বাড়িতে যাই। এইজন্য কিশোরীবাবু তাঁকে ফোন করতে বলেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর জরুরি একটা কথা আছে। বলতে ভুলে গিয়েছিলেন।...

তিন

বেলা দুটোর মধ্যে খেয়ে নিয়ে আধঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ দিলেন কর্নেল। আমার চোখ ঘুমে বুজে আসছিল। কিন্তু রেহাই পেলাম না। অবিনাশবাবুর এবেলা জরুরি কাজ ছিল। তাই তাঁর ড্রাইভার যোগীন্দর আমাদের চণ্ডীহাটিতে কিশোরীবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিল। কর্নেল তাকে ফিরে যেতে বললেন। কিশোরীবাবুর গাড়ি আছে। কাজেই আমাদের ফার্মহাউসে ফিরতে অসুবিধে হবে না।

প্রায় সওয়া তিনটে বাজে। শীত জাঁকিয়ে উঠেছে ক্রমশ। গঙ্গার তীরে বাঁধের ওপর রাস্তায় এগিয়ে শেষপ্রান্তে কিশোরীবাবুর দোতলা বাড়ি। বাড়ির উত্তরে তাঁর একটা আমবাগান। গেট পশ্চিম দিকে। বাঁধের রাস্তা থেকে তাঁর প্রাইভেট রোড নেমে গিয়ে গেটে পৌঁছেছে। এই সংকীর্ণ এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড় গজিয়ে জঙ্গল হয়ে আছে। নিরিবিলি এমন জায়গায় কোন শত্রুর সাংঘাতিক সব

উড়োচিঠি পেয়ে ভদ্রলোক কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন, তাই ভেবে আমার গা ছমছম করছিল।

গাড়ির শব্দে গেটে এসে দাঁড়িয়েছিল বেঁটে গাব্দাগোব্দা একটা মধ্যবয়সী লোক। দোতলা থেকে কিশোরীমোহন ডাঁশের কথা শোনা গেল।—এই বোকারাম! আগে টনিকে বেঁধে রেখে আয়। হাঁদারাম! এতটুকু বুদ্ধি নেই মাথায়।

টনিকে দেখতে পেয়েছিলাম। লম্বাটে ছাইরঙা একটা কুকুর কখন গেটের কাছে এসে নিঃশব্দে হিংস্র দাঁত বের করে আমাদের দেখছিল। ততক্ষণে যোগীন্দর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে। সে এই কুকুরটা সম্পর্কে আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল। তার সায়েবের ডন আর রেক্সি বাঘের মতো ভয়ঙ্কর। কিন্তু ডাঁশবাবুর টনি আরও ভয়ঙ্কর। সে নাকি গেট টপকে এসে গলা কামড়ে ধরে!

লোকটা টনিকে গলার বেল্ট ধরে পাশেই একটা একতলা ঘরের বারান্দার থামে জড়ানো শিকলে বেঁধে এল। তারপর গেটের একটা অংশ খুলে সেলাম ঠুকল।

বাঁদিকে দোতলা বাড়ির উপর-নিচের বারান্দায় ফিকে রঙের গ্রিল। দোতলায় গ্রিলের মধ্যে কিশোরীবাবু আর হালদারমশাইকে বসে থাকতে দেখলাম। নিচের বারান্দার গ্রিলের ভিতরে এক প্রৌঢ়া মহিলা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমার মনে হলো পাঞ্জাবি বা ইরানি মহিলাদের আদল আছে তাঁর চেহারায়।

কিশোরীবাবু দোতলা থেকে বললেন—এই গোবিন্দ! ওঁদের নিয়ে আসবি, না হাঁ করে তাকিয়ে থাকবি!

বুঝলাম এই লোকটাই হরগোবিন্দ। সে কর্নেলের দিকে সত্যি হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। মনিবের ধমক খেয়ে যেন চমকে উঠে বলল—আসুন সার!

দোতলায় গিয়ে দেখি, কিশোরীবাবুর হাঁকডাক যত চড়া হোক, চেহারায় ক্লান্তি বা নিস্তেজ ভাব ছাপ ফেলেছে। গতকাল সকালে কলকাতায় যাঁকে দেখেছিলাম, এখন যেন তাঁর অন্য চেহারা দেখছি।

হরগোবিন্দ ঘর থেকে দুটো চেয়ার এনে দিল। আমরা বসলাম। কিশোরীবাবু বললেন—গোবিন্দ! তুই মোতির মাকে বল, শীগগির একপট কফি আর স্ন্যাক্স পাঠিয়ে দেবে। আর শোন। এবার গেটে তালা এঁটে দে।

হালদারমশাই একবার কর্নেল একবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। বুঝলাম, ওঁর প্রচুর বলার কথা আছে। সময় এবং সুযোগ মতো বলবেন। হরগোবিন্দ আবার কর্নেলকে দেখছিল। সে মনিবের কথায় চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন—আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?

কিশোরীবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—কলকাতা থেকে ফিরে একটু ক্লান্ত ছিলাম।

রাত্রে তো ঘুম আসে না। সকালে একটু ঘুমের টান আসে। তো হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। শরীর কেমন যেন অবশ মনে হচ্ছিল। এটা নতুন উপসর্গ। কর্নেল-সায়েব! অনেক কিছু অসুখ আছে আমার। কাকেও সহজে জানতে দিই না। একটু বেশি হলে ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট আমার ছোটবেলা থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে ছাড়া বিশ্বাস করে কারও ওষুধ খাই না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—অনেক কিছু অসুখ থাকার মানে কোনও অসুখই নেই।

—তার মানে?

—আপনার অসুখের লিস্টটা বরং লিখে দেবেন।

কিশোরীবাবু হাসবার চেষ্ট করে বললেন—ডাক্তার বরাটের প্রেসক্রিপশনগুলো দেখলেই লিস্ট পেয়ে যাবেন।

হালদারমশাই এতক্ষণে মুখ খুললেন। আস্তে বললেন—কিশোরীবাবু! কাইল রাত্রের কথাটা কর্নেলস্যারেরে বলেন।

কিশোরীবাবু নড়ে বসলেন।—হ্যাঁ। আমরা পৌঁছেছি কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। মিঃ হালদার তো এসেই বাড়ির চারদিক ভেতরে এবং বাইরে ঘোরাঘুরি করে দেখে নিলেন। টনি বাঁধা ছিল। সারা রাত্রি গেটের ওপর একটা আলো এবং উঠোনের দিকে একটা আলো পড়ে। রাত্রি একটা নাগাদ আমি গুলিভরা দোনলা বন্দুক নিয়ে বারান্দায় এসে ওই পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ছাতিম গাছটার তলায় টর্চের আলো ফেলেছিলাম। কারণ টনি ওদিকে মুখ করে গর্জন করছিল। মিঃ হালদারও নিচে বারান্দার গ্রিলের ফাঁকে টর্চের আলো ফেলেছিলেন।

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে বললেন—দুইজনের চোখের ভুল হইতে পারে না। ওখানে কেউ খাড়াইয়া ছিল। আলো পড়তেই মন্দিরের আড়ালে ভ্যানিশ হইল।

কর্নেল বললেন—কিশোরীবাবু তাকে চিনতে পারেননি?

কিশোরীবাবু বললেন—নাঃ! এক পলকের দেখা। কিন্তু আমার অবাক লাগছিল টনি লোকটাকে তাড়া করল না কেন? মিঃ হালদারকে টনির জন্য রাত্রে বেরুতে নিষেধ করেছিলাম। সকালে উনি ওখানে গিয়েছিলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন—গোবিন্দেরে কুত্তাটা বাঁধতে কইছিলাম। তারপর ছাতিমতলা থেকে শিবমন্দিরের পিছনটা সার্চ করলাম। শিশিরে মাটি নরম ছিল। একখানে জুতার দাগ পাইলাম। পাঁচিলের পলেস্তারাতে কাদার ছোপ দেখলাম।

কিশোরীবাবু বললেন—পাঁচিল কত উঁচু তা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু পুরনো পাঁচিল। ইট বেরিয়ে আছে। পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়িতে ঢোকা সোজা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অত রাত্রে কে পাঁচিল টপকে ওখানে ঢুকেছিল? সবাই জানে টনি দিনরাত্রি

সবসময় ছাড়া থাকে। আর টনি শিক্ষিত কুকুর। সে লোকটাকে অ্যাটাক করল না কেন?

হালদারমশাই বললেন—চেনাজানা লোক। তাই অ্যাটাক করে নাই।

কিশোরীবাবু বললেন—আমি পর-পর দু'বার গুলি ছুঁড়েছি। চার নম্বর টোটা। গায়ে লাগলে বাঘও আঘাত সামলাতে পারবে না।

একটি মেয়ে ঘোমটা টেনে ট্রে নিয়ে এল এবং টেবিলে রেখে চলে গেল। হালদারমশাই বললেন—দিনের আলো থাকতে থাকতে কর্নেলস্যারেরে স্পটটা দেখাইয়া আনুম। কী কন মিঃ ডাঁশ?

কিশোরীবাবু বললেন—কফি খান কর্নেলসায়েব। শুধু রাত্রের ঘটনার জন্য আপনাকে আসতে বলিনি। কলকাতায় কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। অথচ সেটাই আমার আসল কথা ছিল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—এখন বলতে পারেন।

কিশোরীবাবু চাপা স্বরে বললেন—কেউ আমাকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখেছে। কিন্তু কেন মেরে ফেলবে, তা জানায়নি। আপনি কেন যে এ প্রশ্নটা করলেন না, ফেরার সময় সেটা মাথায় এল। তখন মিঃ হালদারকে বললাম কথাটা।

হালদারমশাই বললেন—আমি কইলাম, কর্নেল ঠিক সময়ে প্রশ্ন করবেন। ভাববেন না।

কর্নেল বললেন—আপনি তো সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের লিস্ট দিয়ে আমাকে বলেছেন কার সঙ্গে কী শত্রুতা আছে। অবশ্য কুসুম সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা দেননি।

কিশোরীবাবু আরও চাপা স্বরে বললেন—তিন মাস আগে আমি আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উইল করেছি। রেজিস্টার্ড উইল। আমার লইয়ার ব্রজেন্দ্রনাথ রায়। উইটনেস ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট এবং ত্রিবেদীর বিরোধী দলের নেতা রণবীর প্রসাদ।

—রেজিস্টার্ড কপি আপনি কাছে রেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—আপত্তি না থাকলে প্রপার্টি কাদের কী ভাবে দিয়েছেন বলুন।

—আপত্তি নেই। কুসুম পাবে এই দোতলা বাড়িটা। আর বাকি অংশ মন্দির সমেত গোবিন্দ, মানে আমাদের পারিবারিক কর্মচারী হরগোবিন্দ পাবে। আমবাগানটা দিয়েছি বেঙ্গল ক্লাবের নামে।

—আপনি কি বলতে চান এই উইল করার জন্যই কেউ আপনাকে প্রাণে মারবে বলে হুমকি দিচ্ছে?

একটু চুপ করে, থাকার পর কিশোরীবাবু বললেন—নাঃ! আমার সম্পত্তির ব্যাপারে কেউ নাক গলানোর সাহস পাবে না। আপনাকে বলেছি, আমি বিষাক্ত ডাঁশ। নীল মাছি!

—তা হলে?

—এই কথাটা আপনার জানা দরকার।

—কেন?

—জানি না। ওই যে বলেছি, আমি অনেকসময় বুঝতে পারি না—নাঃ। জাস্ট্ মনে হয়েছিল আপনি সব জেনে রাখুন।

—অবিনাশবাবু জানেন আপনার উইলের কথা?

কিশোরীবাবু কর্নেলের দিকে কেমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—অবিনাশবাবুকে জানাইনি। আমার অনুরোধ, আপনারাও ওঁকে জানাবেন না। ওঁকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। একজন বাইজিকে এই দোতলা বাড়ি দিয়েছি এ কথা কোন মুখে ওঁকে বলি? বলতে পারেন, কেন দিলাম? দিলাম। অন্তত জীবনের শেষ দিনগুলো একজন আমাকে সঙ্গ দেবে বলে। হ্যাঁ—এই হতভাগিনী মেয়েটিকে আমি যৌবনে—রমলার মৃত্যুর আগে—রমলার মৃত্যুর পরেও—নাঃ! এসব আমার জীবনের গোপন কথা। না-ই বা শুনলেন। এখনও মধ্যরাতে কুসুম দু'কলি ঠুংরি গাইলে আমি জীবনের মানে খুঁজে পাই। ওর গলা এখনও নষ্ট হয়নি।

হালদারমশাই বলে উঠলেন—হুঃ! খুব ভালো গান করেন উনি। আইজ ভোরে আপন মনে গান করতাছিলেন। ভাবলাম রেডিয়ো না টিভি। কিন্তু বাজনা নাই। তখন বুঝলাম কে গায়।

কর্নেল বললেন—কিশোরীবাবু! কুসুমকুমারী কি উইলের কথা জানেন?

—জানে। ওকে বলেছি।

—হরগোবিন্দ?

—জানে। ওকেও বলেছি। খুব খুশি। ও ব্রাহ্মণ। মন্দির পেয়ে ওর আনন্দ বেশি।

—বেঙ্গল ক্লাবের নামে বাগান দানের কথা কে জানে?

—ডাক্তার বরাট ক্লাবের সভাপতি। আমার মৃত্যুর পর সে তো ব্যক্তিগতভাবে বাগান পাচ্ছে না। পাবে বেঙ্গল ক্লাব। কাজেই ডাঃ বরাটের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন ওঠে না। হ্যাঁ, ক্লাবের সবাই কথাটা জানে।

—উইলের সঙ্গে উড়ো চিঠির সম্পর্ক নেই বলে আপনার ধারণা?

—হ্যাঁ। জন্মেছি যখন, তখন মরতেই হবে। রেজিস্টার্ড উইল। সম্পত্তি যারা

পাবার, তারা পাবে। কাজেই হাতের তীর ছুঁড়ে মেরেছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমার প্রাণনাশ করবে, এটা ভাবলেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কর্নেলসায়েব! আমাকে দয়া করুন। সেই লোকটাকে শুধু খুঁজে বের করে দিন। আমি তাকে প্রাণে মারব না। শুধ তার গায়ে বসব। আমি ডাঁশ। বিষাক্ত নীল মাছি।

কিশোরীবাবুকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে যেন যাত্রা-থিয়েটারের সংলাপ আওড়াচ্ছেন।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে বললেন—এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা যে, আগামী কাল বুধবার রাত্রি তিনটে চল্লিশ মিনিটে কেউ আপনাকে মেরে ফেলবে। আপনি নিজে কি বিশ্বাস করেন এটা কারও পক্ষে সম্ভব?

কিশোরীবাবু মাথা নাড়লেন—জানি না। কিন্তু এত তার স্পর্ধা যে—

উনি হঠাৎ থেমে গেলেন। হালদারমশাই বললেন—চিন্তা করবেন না। আপনারে কইয়া দিচ্ছি, আমরা তিনজন কাইল এই ঘরে আপনারে পাহারা দিমু। আমাদের তিনজনেরই ফায়ার আর্মস আছে।

—কথাটা তা নয়, মিঃ হালদার! শত্রুর স্পর্ধা! এভাবে আমাকে চিঠি লেখে এত তার সাহস? কে সে? এটাই প্রশ্ন।

শীতের দিনের আলো ততক্ষণে কমে গিয়েছিল। হরগোবিন্দ বাড়ির আলো জ্বেলে দিল। সে দোতলায় এসে বলল—বাইরে বড্ড হিম। সায়েবরা ঘরে বসলে ভালো হয়।

সে পাশের ঘরের টিউবলাইট জ্বেলে দিয়ে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিল। তারপর ট্রে গুছিয়ে নিয়ে গেল। কিশোরীবাবু বললেন—বারান্দার বাইরে থেকে তালা এঁটে দে। কুসুম বেরুলে ওর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। আর টনিকে ছেড়ে দে। সায়েবরা বেরুনোর সময় বেঁধে রাখবি।

এবার আমরা ঘরে গেলাম। এটা কিশোরীবাবুর বেডরুম। একপাশে সেকেলে কারুকার্যখচিত পালঙ্ক। পুরনো আমলের সোফাসেট এবং গোল শ্বেতপাথরের টেবিল। প্রকাণ্ড চিনামাটির ফুলদানি, কিছু ভাস্কর্য এবং আলমারিতে অজস্র শিল্পদ্রব্য সাজানো। পালঙ্কের পাশে দেওয়ালে আয়রন চেস্ট। মেঝে পুরোটাই নরম কার্পেটে ঢাকা।

কিশোরীবাবু এবং আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম। পালঙ্কের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে একটা দোনলা বন্দুক। বালিশের পাশে সার্চলাইটের মতো দেখতে একটা প্রকাণ্ড টর্চ। দেওয়ালে একটা ঢালের মধ্যে দুটো তলোয়ার সাজানো আছে। তিনটে স্টাফ্‌ড্ হরিণের শিংসুদ্ধ মাথা। একটা বড়ো অয়েলপেন্টিংয়ে এক যুবতীর

মুখ। উনিই কি কিশোরীবাবুর স্ত্রী রমলা দেবী?

কর্নেল ঘরটা খুঁটিয়ে দেখে একটু হেসে বললেন—পুরনো আমলের বাড়ি। দেওয়াল, ছাদ বা মেঝে ফুঁড়ে কোনও শত্রুর এ ঘরে হানা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে—আপনি শুধু জানতে চান কে উড়ো চিঠিগুলো লিখেছে। অন্তত দু'জন লিখেছে তা আপনাকে বলেছি। আশা করি, কাল সন্ধ্যার মধ্যে কোনও সূত্র পেয়ে যাব।

কর্নেলের কথায় অবাক হয়ে বললাম—আপনি এ বাড়িতে এসেই সিওর হয়ে গেলেন?

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। হালদারমশাই বললেন—কাইল রাত্রে যে লোকটা ছাতিমতলায় খাড়াইয়া ছিল, তার জুতার ছাপ কর্নেলস্যারের দেখা উচিত ছিল। কথায়-কথায় টাইম হইল না।

আমি বললুম—উড়ো চিঠির কথা কি কুসুমকুমারী জানেন?

কিশোরীবাবু বললেন—না। আমি কাকেও বলিনি। পুলিশকে বলেছিলাম। তারপর অবিনাশবাবুকে বলেছি।

এই সময় বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। কিশোরীবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন—কুসুম! সাড়া না দিয়ে চুপিচুপি আসছ কেন? আড়ি পেতে কথা শোনা হচ্ছিল?

সেই প্রৌঢ়া মহিলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁকা হেসে বললেন—আড়িপাতার দরকার কী? এ কুসুমের পেটে দশঘাটের জল আছে। অনেক মানুষ দেখেছি। তোমার মতো দেখিনি বাপু! সবসময় পায়ের কাছে সাপ দেখছ!

—কেন একথা বলছ?

—বলছি কি এমনি-এমনি? কলকাতা থেকে গোয়েন্দা অফিসার আনিয়েছ। আমাকে খুব ন্যাকা ভেবেছ। তাই না? আসল কথাটা আমাকে না বলে বাইরের লোকেদের বলে পার পাবে ভাবছ! আমি জানতে এলাম এত লুকোছাপা কেন গো বাবু? দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ। উইলে এই বাড়ি দিয়েছ। তারপর মত বদলে উইল বাতিল করতে চাও তো করো। সম্পত্তি তোমার। আমি কি গায়ের জোরে দখল করব?

কিশোরীবাবু হাসতে হাসতে বললেন—কী বাজে কথা বলছ কুসুম? এই সায়েবকে দেখছ, ইনি একজন মিলিটারি অফিসার। এই কর্নেলসায়েবের সঙ্গে দেশের বড়-বড় মানুষের চেনাজানা আছে। এঁর মতো মানী মানুষের সামনে বেয়াদপি কোরো না।

হালদারমশাই ইতিমধ্যে দ্রুত এক টিপ নস্যি নিয়েছিলেন। হাসবার চেষ্টা করে তিনি বললেন—আমারে গোয়েন্দা অফিসার কইলেন আপনি। ক্যামনে জানলেন

আমি গোয়েন্দা অফিসার?

কুসুমকুমারী শক্ত মুখে বললেন—শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়। বাবু ভেবেছে, উইলে দোতলা বাড়ি দিয়েছে বলে কুসুমের তর সইছে না। তাকে প্রাণে মেরে এখনই বাড়ি হাতাবে।

কিশোরীবাবু বললেন—কী বলছ তুমি? দেওয়ালের কান আছে। এখানে এসে বসো। এসো।

—আমি সায়েবদের পাশে বসতে পারি? বলে কুসুমকুমারী ঘরে ঢুকে পালঙ্কের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ঠোঁটে লিপস্টিক নেই বটে, তবে হালকা মেকআপ আছে। স্বাস্থ্যবতী মহিলা। চুলে অবশ্য কলপ দেয়নি। কিন্তু একসময় রূপবতী ছিল, তা স্পষ্ট। পরনে চওড়া নকশাপাড় শাড়ি এবং শাড়ির জমিনে নকশা করা। হাতকাটা ব্লাউস। গলায় জড়োয়া নেকলেস। কানে মুক্তোখচিত দুল। দু'হাতে কাঁকন এবং রঙবেরঙের চুড়ি।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকে দেখছিলেন। এবার বললেন—কিশোরীবাবু উইল বদলাবেন কে বলেছে তোমাকে?

—আমি সোজা কথার মানুষ সায়েব! পষ্ট কথা বলার জন্য জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। শুধু এই বাবুকে জানতাম খাঁটি মানুষ। পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসেন।

—বুঝলাম। কিন্তু তোমাকে কে বলেছে কিশোরীবাবু উইল বদলাবেন?

—ডাক্তারবাবু।

কিশোরীবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—ডাক্তার বরাট? ওকে আমি গুলি করে মারব।

কুসুম বাঁকা হেসে বলল—তা পারবে না। ওর হাতে তোমার প্রাণ বাবু।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল...

চার

কিশোরীবাবু রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন—বলুন ব্রজেনদা!...বাজে কথা! কে বলল আপনাকে?...না। মোটেই না। তেমন কিছু করতে গেলে আপনি জানবেন না এটা কেমন করে ভাবলেন?...দেখুন ব্রজেনদা! আপনাকে কথাটা কে বলেছে আমি জানি। এইমাত্র কুসুম বলছিল ডাক্তার বরাট তাকে নাকি একই কথা বলেছে।...আমার ভাগনে? কে সে?...মিথ্যা কথা। কোনও শুওরের বাচ্চা আমার ভাগনে নয়। কী নাম তার?...বারীন রায়? ...নাঃ। চিনি না। বাড়ি কোথায় তার? পাকুড়?...ব্যাটাচ্ছেলে ফের আপনার কাছে গেলে তাকে কৌশলে আটকে রেখে আমাকে খবর দেবেন।...ঠিক আছে। মেজাজ আবার বিগড়ে গেল। ছাড়ছি।

রিসিভার রেখে কিশোরীবাবু কুসুমের দিকে তাকালেন। কুসুম হাসল।—এবার

বুঝতে পারছ? কুসুমকে বাড়ি লিখে দিয়েছ শুনে টি-টি পড়ে গিয়েছে! কথার কথা বলছি। তোমার একটা কিছু হলে এ বাড়ি আমি রাখতে পারব? পাকুড় কেন, হিল্লিদিল্লি থেকে আপ্তকুটুমজ্ঞাতি সেজে মামলা ঠুকে দেবে। নয় তো আমাকে জোরজুলুম করে তাড়িয়ে দেবে। এখনও বলছি বাবু, তোমার উইল বদলাও। আমি বাড়ি চাই না। রাত পোহালেই আমাকে আর এ বাড়িতে দেখতে পাবে না!

বলে কুসুমকুমারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে আমার মধ্যে কিশোরীবাবুর প্রতি ঘৃণার ভাব ছিল। সেটা বেড়ে গেল। চোখের সামনে তথাকথিত এক 'বাবু' আর তার 'রক্ষিতা' বাইজি দেখছিলাম। আশ্চর্য! কর্নেল নির্বিকার মুখে চুরুট টানছেন। এই কেসে জড়ানো আর ওঁর উচিত হবে না। হালদারমশাই-ই বা কেন তাঁর নীতিবোধ হারিয়ে ফেলেছেন? তাঁর এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল।

কিশোরীবাবু রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন—ডাক্তার আছে? আমি ডাঁশবাবু বলছি।...কলে গেছে? কে বলছ?...কালীচরণ! শোনো। ডাক্তার এলে বলবে, আমি ডেকেছি। আমার আবার শরীর খারাপ হয়েছে।

তিনি রিসিভার রেখে কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন—আমি এবার উঠব। কাল সময় মতো দেখা হবে।

কিশোরীবাবুকে ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল। বললেন—আচ্ছা! আমার একা থাকতে ইচ্ছে করছে। বরাট এলে একটা বোঝাপড়ার জন্য তৈরি হওয়া দরকার।

হালদারমশাই বললেন—কর্নেলস্যার যাইবেন কীসে?

কিশোরীবাবু বললেন—আমি নিজে পৌঁছে দিতাম। কিন্তু ড্রাইভিংয়ের রিস্ক নেব না। গোবিন্দকে বলছি। ড্রাইভারকে ডেকে আনুক। কাছেই থাকে।

বলে তিনি বাজখাঁই গলায় হাঁক দিলেন—গোবিন্দ! এ গোবিন্দ!

বাইরে নিচে থেকে তখনই সাড়া এল—যাচ্ছি!

কিছুক্ষণ পরে সে এলে কিশোরীবাবু তাঁর ড্রাইভার লালুকে শিগগির ডেকে আনতে বললেন। গোবিন্দ দ্রুত চলে গেল।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আস্তে বললেন—কুসুম বলে গেল ডাক্তার বরাটের হাতে আপনার প্রাণ। কেন?

কিশোরীবাবু গম্ভীরমুখে বললেন—বরাটের ওষুধ খাই, কুসুমের এটা পছন্দ নয়।

—আপনার নিজের কী ধারণা?

—কুসুম হয়তো এতদিন ঠিকই বলেছে। আর ওর ওষুধ আমি খাব না। কর্নেল-সায়েব! কুসুমের এখনকার কথাটা শোনার পর আমার সন্দেহ হচ্ছে, বরাট আমার মাথা বিগড়ে দিতে চায়। ওর সঙ্গে আজ রাত্রেই চরম বোঝাপড়া হবে।

—উঁহু! আমার কথা শুনুন। আজ রাতে ডাক্তার বরাটকে বাড়িতে ডাকবেন না।

—ডাকব না?

—না। নিষেধ করে দিন। ডাক্তার বরাটের সঙ্গে আমি যথাসময়ে কথা বলব।

—এর মধ্যে যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি?

—অবিনাশবাবুকে ফোন করবেন। উনি অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করবেন।

কিশোরীবাবু ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে স্বগতোক্তি করলেন—আমি ডাঁশ। বরাটের গায়ে বসে ওকে পাগল করে ছাড়ব। শুওরকা বাচ্চা! আমাকে চিনেও চেনে না।...

কিছুক্ষণ পরে লালু ড্রাইভার এসে কিশোরীবাবুর গ্যারাজঘর থেকে জিপগাড়িটা বের করল। কুকুরটা হরগোবিন্দের ঘরের বারান্দার থামে বাঁধা ছিল। গেট থেকে জিপগাড়ি বেরুলে হঠাৎ হালদারমশাই বললেন—আমি আপনাগো সাথে যামু। লালুর সাথে ব্যাক করুম।

গাড়িটা সাধারণ জিপ নয়। পিছনেও দুটো সিট আছে। কর্নেল লালুর ডানপাশে বসলেন। আমি আর হালদারমশাই বসলাম পিছনে। সারাপথ কর্নেল লালুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিলেন। যেটুকু কানে আসছিল, তা গঙ্গার কোথায়-কোথায় মরশুমি জলচর পাখি এসেছে সেই সংক্রান্ত কথাবার্তা। প্রচণ্ড শীতে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু হালদারমশাই গত রাতে ছাতিমতলায় পাঁচিল টপকে-আসা লোকটা সম্পর্কে চাপাস্বরে আমাকে তাঁর থিয়োরি শোনাচ্ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, লোকটা ডাঁশবাবুর বাড়ি প্রায়ই আসে বলেই কুকুরটা তাকে আক্রমণ করেনি এবং লোকটা কুসুমকুমারীর সঙ্গেই আগেকার কথামতো দেখা করতে এসেছিল। ডাঁশবাবুর সতর্কতায় তাকে প্রাণে বেঁচে পালাতে হয়েছিল।

অবিনাশবাবুর বাংলোয় পৌঁছে দেখি, তিনি ওভারকোট আর টুপি পরেছেন। তাঁর হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা রাইফেল। কাছাকাছি কুকুরের গর্জনও শুনলাম। গোয়েন্দাপ্রবর শোনামাত্র সভয়ে বললেন—এখানেও কুত্তা? বাইন্ধ্যা রাখছে তো?

কর্নেল বললেন—বাঁধা না থাকলেও আপনার ভয়ের কারণ নেই।

হালদারমশাই লালুকে বললেন—ভাইটি। হাম আধাঘণ্টাবাদ যামু! সমঝা?

লালু বলল—ঠিক হ্যায় সাব। মেরা এক ভাতিজা ইঁহাপর কাম করতা হ্যায়। উসিকা সাথ ম্যায় বাতচিত করুঙ্গা। এ শিবু! রঘুয়াকো বোল দে না জেরা!

গেস্টরুমে ঢুকে আমরা বসলাম। অবিনাশবাবু শাকিলমিয়াঁকে কফি আনতে বললেন। তারপর মুচকি হেসে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন—কিশোরী সম্পর্কে যা বলেছিলাম, ঠিক কি না?

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন—আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিঃ কে কে হালদার

অর্থাৎ আমাদের হালদারমশাই। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন! এঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম। প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইনি।

অবিনাশবাবু নমস্কার করে বললেন—আশা করি কিছু ক্লু পেয়ে গেছেন?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন—তেমন ক্লু পাই নাই। তবে এইটুকু বুঝছি, ডাঁশবাবু নিজের ঝামেলা নিজে বাধাইছেন।

অবিনাশবাবু বললেন—বলেন কী! কীভাবে বাধালেন?

হালদারমশাই উইলের কথা তুলবেন ভেবে আমি বিব্রত বোধ করছিলাম। কারণ কিশোরীবাবু ওই কথাটা অবিনাশবাবুকে জানাতে নিষেধ করেছেন। গোয়েন্দাপ্রবর কিছু বলার আগেই কর্নেল বলে উঠলেন—একটা বাইজি মেয়েকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন। বুঝলেন মিঃ রায়চৌধুরি? হালদারমশাই কিন্তু ওর গান শুনে খুব খুশি।

হালদারমশাই খি খি করে হেসে উঠলেন।—এখনও গলায় সুর আছে। আমি জাস্ট্ বুঝতে চাইছিলাম, সত্যি বাইজি কি না।

অবিনাশবাবু সকৌতুকে বললেন—সত্যিকার বাইজিরা নাচেও এক্সপার্ট। আপনি ওর নাচ দেখতে চাননি?

—নাঃ মিঃ রায়চৌধুরি! মাইয়াটা খুব তেজি। সবসময় ফোঁস কইর‍্যা ওঠে। তাই সাহস পাই নাই।

শাকিলমিয়াঁ কফি রেখে গেল। অবিনাশবাবু বললেন—আমি একটু আগে কড়া-চা খেয়েছি। আপনারা কফি খান। আমি এক চক্কর ঘুরে আসি।

রাইফেল কাঁধে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। বাইরে কুকুরের গর্জন শোনা গেল। হালদারমশাই কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—উনি গেলেন কোথায়?

কর্নেল বললেন—ফসলের মাঠ আর ফলের বাগানে চোরের উপদ্রব হয়। পাহারার ব্যবস্থা আছে। তবু নিজে লক্ষ্য রাখেন। তাছাড়া ওঁর সেগুন গাছের জঙ্গল আছে। উনি বলেন সেগুনবাগিচা। চোরেরা সেখানেও হানা দেয়। যথাসময়ে আপনি স্বচক্ষে মিঃ রায়চৌধুরির কীর্তি দেখে অবাক হবেন।

আমি চাপাস্বরে বললাম—হালদারমশাই ওঁকে উইলের কথা বলে ফেলবেন ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। ভাগ্যিস কর্নেল কথা ঘুরিয়ে দিলেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কাঁচুমাচু মুখে বললেন—ব্যাবাক ভুইল্যা গিছলাম। তবে মিঃ রায়চৌধুরি কর্নেলস্যারের বন্ধু। কর্নেলস্যার কি ওনারে না কইয়া থাকতে পারবেন?

কর্নেল হাসলেন—হ্যাঁ। তবে এখনও সে-সময় হয়নি।

হালদারমশাই চুপচাপ কয়েকবার কফিতে চুমুক দেওয়ার পর হঠাৎ উঠে দরজার কাছে গেলেন। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে খুব চাপাস্বরে বললেন—

ডাঁশবাবুর সামনে সব কথা কওন যায় না। তাই আপনাগো সাথে আইলাম।

—বুঝেছি। বলুন।

—ডাঁশবাড়ির দোতলা ঘরের ওপরে-নিচে সামনের বারান্দায় গ্রিল আছে। কিন্তু মাইয়াটা—কুসুম থাকে নিচের তলার শেষ ঘরে। সামনে বারান্দায় গ্রিল। কিন্তু অর ঘরের দরজা দুইখান। একখান গ্রিলের সামনে—দক্ষিণে। অন্যখান ঘরের পূর্বে। ওই দরজা দিয়া পূর্বে খোলা বারান্দায় কুসুম রৌদ্রে বইয়া থাকে।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—কাইল রাত্রে আমি ওত পাতছিলাম। অর ঘরে চাপা শব্দ শুইন্যা আমি. চুপিচুপি বারান্দায় গেলাম। সেইসময় কুত্তাটা ডাকছিল। টর্চের আলোয় আমি যারে দেখছি, আমার ধারণা সে কুসুমের ঘরে পূর্বের দরজা দিয়া ঢুকত। ডাঁশবাবু গুলি ছুড়লেন। তারপর লোকটা পলাইয়া গেল। আবার কুসুমের ঘরে দরজা বন্ধ করার চাপা শব্দ শুনছিলাম। বোঝেন তা হইলে।

—আর কিছু?

গোয়েন্দাপ্রবর ফিসফিস করে বললেন—শিবমন্দিরের পিছনে পাঁচিলে একখান দরজা আছে। সন্ধ্যায় গোবিন্দ সেখানে তালা আঁটে। কিন্তু ভোরে সে তালা খুইল্যা দেয়। ক্যান কী, তার বউ যমুনা ওই দরজা দিয়া পুকুরের ঘাটে যায়। আইজ আমি জুতার ছাপ দেখার পর দরজা খুইল্যা ঘাটে গিছলাম। বাঁদিকে আমবাগান। ডানদিকে পোড়ো বাড়ি। ব্যাবাক ধ্বংসস্তূপ। জঙ্গল গজাইয়া আছে। গোবিন্দ কইছিল ওটা পুরানো জমিদারবাড়ি ছিল।

—আপনি ডাক্তার বরাটকে তো দেখেছেন?

—হঃ! রোগা টল ফিগার। খুব হাসিখুশি মেজাজ। কিন্তু আমার ইম্প্রেশন—ওই যে কয়, শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেইখ্যা চেনা যায়। কুসুমের লগে ফস্টিনস্টি করতাছিল।

—আর কিছু?

—গোবিন্দর বউ যমুনা কুসুমেরে পছন্দ করে না। আমারে চুপিচুপি কইছিল, ওই পাপেরে আশ্রয় দিয়া তার বাবু ঠিক কাজ করেন নাই। যমুনার উপায় নাই তাই ওবাড়িতে আছে। গোবিন্দেরেও সে খুব দোষ দিল। কইল, মোতির বাবার ঘেন্নাপিত্তি নাই। আর হ্যাঁ—কইতে ভুলছি। কুসুম স্বপাক খায়। যমুনারে সে-ও পছন্দ করে না।

শিবু এসে বলল—লালু ড্রাইভার বলছে দেরি হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের পথে গাড়ি নিয়ে ফিরতে হবে।

হালদারমশাই মাথায় মাফলার জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন।—চলি কর্নেলস্যার।

কর্নেল তাঁকে বিদায় দেবার ভঙ্গিতে অনুসরণ করলেন। আমার মনে হলো, সম্ভবত ওঁকে গোপনে কর্নেল কোনও নির্দেশ দিতেই গেলেন। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। হাড়কাঁপানো হিম। নিচে দক্ষিণের উপত্যকায় কাছে ও দূরে কুয়াশার মধ্যে আলোগুলো ভুতুড়ে দেখাচ্ছিল। অবিনাশবাবু রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন। সঙ্গে কুকুরও আছে। ওই কুয়াশাভরা ব্যাপকতার মধ্যে ভদ্রলোক কোথায় ঘুরছেন দেখা সম্ভব নয়। তবে আবার বুঝলাম মানুষটি দুঃসাহসী। নিছক টাকার লোভে বা রোজগারের জন্য অবিনাশ রায়চৌধুরি এই দুর্গম এলাকায় ফার্ম করেননি, তাও বোঝা যায়। আসলে তাঁর এটা একটা নেশা। এই ধরনের বন্য পরিবেশের উপযোগী কাজকর্মের মধ্যে সময় কাটানো নেশা ছাড়া আর কী?

একটু পরে কর্নেল ফিরে এসে বললেন—জয়ন্ত কি রাতের প্রকৃতিদর্শন করছ?

বললাম—হ্যাঁ। তবে যদি বলেন একা ওই প্রকৃতির মধ্যে একচক্কর ঘুরে এস, আমি মোটেও রাজী হব না।

কর্নেল ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন—হালদারমশাই ঝোঁকের বশে আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। তা ছাড়া ওঁর কিছু বলার কথাও ছিল। কিন্তু লালু ড্রাইভারকে তিনি চেনেন না। তাই একটু সতর্ক থাকতে চান। আমি ওঁকে পরামর্শ দিলাম, রিভালভার রেডি রেখে নিশ্চিন্তে চলে যান। লালুর মতিগতি খারাপ দেখলে বরং তার নাকের ডগা দিয়ে এক রাউন্ড ফায়ার করবেন। কিন্তু সাবধান! লালুর নাকে যেন গুলি না লাগে।

বললাম—লালুর মতলব খারাপ হলে হালদারমশাইকে ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলতে পারে।

কর্নেল বললেন—হালদারমশাইকে তুমি বরাবর বোকা ভাবো জয়ন্ত! তোমাকে বহুবার মনে করিয়ে দিয়েছি, উনি একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। জেদি আর হঠকারী হলে কী হবে? নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতা ওঁর মজ্জাগত। যাক ওকথা। তুমি দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও।

বলে তিনি টেবিলল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। জ্যাকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে পকেট থেকে কিশোরীবাবুকে লেখা সেই উড়ো চিঠিগুলো দেখতে থাকলেন। যথারীতি আতস কাচের সাহায্যে কী যেন পরীক্ষা করছেন বলে মনে হচ্ছিল।

একটু পরে কর্নেল বিড়বিড় করে আওড়ালেন : 'তারপরা চিত্ত বলে সেটা হবে মিত্যু!'

উত্তেজনা চেপে বললাম—সেই লাইনটা!

—হ্যাঁ। এটা শুদ্ধ করে নিলে দাঁড়াচ্ছে : 'তারপর চিত্ত বলেছে সেটা হবে মৃত্যু।' চিত্ত! ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট! 'বলে'-র পর ডটপেনের একটা বাঁকা রেখা

দেখতে পাচ্ছি ওটা সম্ভবত 'বলেছে'।

—তা হলে চিঠিটা যে লিখেছে, ডাক্তারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে।

—বোঝা যাচ্ছে না। সে ডাক্তারবাবুকে 'চিত্ত' বলে ডাকে নাকি? অথচ সে অর্ধশিক্ষিত—নাঃ! অর্ধশিক্ষিত নয়। নেহাত সাক্ষর। চিঠি লিখতে পারে না। কিন্তু সে লিখেছে। কিংবা কেউ নিজে না লিখে তাকে দিয়েই লিখিয়েছে। অথবা লিখতে হুকুম দিয়েছিল। যে লিখেছে, সে 'চিত্ত' শব্দটা কষ্ট করে লিখেছে। নাঃ! ডাক্তারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই।

বলে কর্নেল কিছুক্ষণ চুপচাপ অন্য চিঠিগুলো পরীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর আধপোড়া চুরুটটা জ্বেলে ধোঁয়া ছাড়লেন।—জয়ন্ত! এই পাঁচটা চিঠি সম্ভবত কিশোরীবাবুর কোনও শত্রু লেখেনি। বরং তাঁর কোনও হিতৈষী তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে। সে তত লেখাপড়া জানে না।

—তা হলে সে ডাক্তার বরাটের চক্রান্ত টের পেয়েই কিশোরীবাবুকে সতর্ক করেছে।

—সম্ভবত।

একটু পরে বললাম—ছ'নম্বর চিঠিটা শিক্ষিত লোকের লেখা।

—হ্যাঁ। এবং এই লোকটাই কিশোরীবাবুর শত্রু হতে পারে। এই কাগজটা সম্ভবত কোনও পুরনো বইয়ের গোড়ার দিক থেকে ছেঁড়া। হাতের কাছে কাগজ না পেয়ে সে বইয়ের টাইটেল পেজ বা উৎসর্গপাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে এই কাগজটা। খুঁজে বের করা কঠিন।

—খড়ের গাদায় সূচ খুঁজতে যাওয়ার ব্যাপার।

—হুঁ।

কাগজগুলো আবার পকেটস্থ করে আতস কাচ কিটব্যাগের চেন খুলে যথাস্থানে রেখে কর্নেল বললেন—দরজা খুলে দাও। কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। মিঃ রায়চৌধুরি ফিরে আসছেন।

দরজা খুলে দিলাম। তারপর ঘরে বিছানায় বসে বললাম—আশ্চর্য! ট্রেনজার্নিতে আমার ঘুম হয়নি গতরাতে। দিনেও ঘুমোনোর সুযোগ পাইনি। ঘুমের কথা ভুলেই গেছি। পৌনে দশটা বাজে।

একটু পরে অবিনাশবাবুর সাড়া পাওয়া গেল।—শিবু! কর্নেলসায়েবকে বল, তাঁর ফোন এসেছে।

শোনামাত্র কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। শাকিলমিয়াঁ এসে সেলাম দিয়ে বলল—ডাইনিং রুমমে আইয়ে সাব। ডিনার রেডি।

—চলো। যাচ্ছি।

কর্নেলকে বারান্দায় আসতে দেখলাম। তিনি কাছে এসে গম্ভীর মুখে বললেন—কিশোরীবাবু ফোন করেছিলেন। তাঁর কুকুর টনিকে কেউ শিবমন্দিরের পিছনে মাথায় গুলি করে মেরেছে। গুলির শব্দ বাড়ির কেউ শুনতে পায়নি। টনির সাড়াশব্দ না পেয়ে হরগোবিন্দ টর্চ নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল।

—হালদারমশাই পৌঁছেছেন?

—এখনও পৌঁছাননি। পৌঁছে ওঁকে ফোন করতে বলেছি।

সে রাত্রে হালদারমশাইয়ের ফোন এসেছিল সাড়ে দশটায়। গঙ্গার তীরে রাস্তায় ট্রাকের বড্ড জ্যাম ছিল। তাই ফিরতে দেরি হয়েছে। তিনিও টনির শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন। কিশোরীবাবু ঘটনাটা থানায় জানিয়েছেন। পুলিশ তখনও যায়নি।...

পাঁচ

সে রাতে বেঘোরে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম ভেঙেছিল শাকিলমিয়াঁর ডাকে। তার হাতে বেড-টি। কর্নেল প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। চা খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে প্যান্টশার্ট সোয়েটার এবং জ্যাকেট পরে তৈরি ছিলাম। কারণ কর্নেল রাত্রে বলেছিলেন, আমরা আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে বেরুব।

বারান্দায় গিয়ে বসলাম তখন সাড়ে সাতটা বাজে। বাংলোবাড়ির দক্ষিণে নিচের উপত্যকা কুয়াশায় ঢাকা। পূর্বের উপত্যকায় ঘননীল টিলাপাহাড়ের বুকেও কুয়াশা জমে আছে। তবে ফিকে লাল রোদ এসে বাংলোকে ছুঁয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে নিচের উপত্যকা থেকে চড়াই বেয়ে কর্নেল আর অবিনাশবাবুকে আসতে দেখলাম। অবিনাশবাবুর কাঁধে রাইফেল। তবে তাঁর সঙ্গে কুকুর নেই। তিনি বাংলোর দক্ষিণের গেট খুলে ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে পশ্চিমের গেটের দিকে চলে গেলেন। কর্নেল সোজা এসে অভ্যাসমতো সম্ভাষণ করলেন—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে?

বললাম—মর্নিং কর্নেল। এমন ঘুম জীবনে কখনও ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না।

কর্নেল বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে বললেন—মিঃ রায়চৌধুরির সেগুনবাগিচা দেখে এলাম। ওখানে একটা গাছে একদল সারস এসে জুটেছে। কুয়াশার জন্য প্রজাতি বোঝা গেল না।

—আপনি পোশাক বদলাবেন না?

—নাঃ। প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়েছি মৈলি নদীতে। কফি খেয়েই বেরুব।

হাসতে হাসতে বললাম—সামরিক রীতিতে প্রাতঃকৃত্য সেরেছেন সম্ভবত?

—কেন?

—টুথব্রাশ পেস্ট ইত্যাদি তো বাথরুমে দেখলাম।

কর্নেল হাসলেন—মৈলি নদীর ধারে বাবলাগাছ আছে। মিঃ রায়চৌধুরির দেখাদেখি বাবলাগাছের ডালে দাঁতন তৈরি করেছিলাম। মিঃ রায়চৌধুরি আমার মতোই নেচারিস্ট।

অবিনাশ রায়চৌধুরিকে এতক্ষণে পশ্চিমের বারান্দায় দেখতে পেলাম। উনি ওদিকে অদৃশ্য হলেন। তার কিছুক্ষণ পরে ট্রে-হাতে শাকিলমিয়াঁ এল এবং তার পিছনে অবিনাশবাবু। আমাকে সম্ভাষণ করে তিনি কর্নেলের পাশে বসলেন। বললেন—যোগীন্দর আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। তবে আমার মতে তাড়াহুড়ো না করে ব্রেকফাস্ট করেই বেরুলে পারতেন। পুলিশ কিশোরীবাবুর কেসটা এবার গুরুত্ব দিয়ে দেখবে মনে হচ্ছে।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—হ্যাঁ। তবে আমি যথাসময়ে ফোনে জানিয়ে দেব, আমরা আজ লাঞ্চ খেতে ফিরব কি না।

অবিনাশবাবু চাপাস্বরে বললেন—আপনাকে বলেছি, থানার অফিসার-ইন-চার্জ হরিপ্রসাদ দুবেকে আপনার কথা আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম। গতকালও ওঁকে বলেছি। আমার মনে হয়, আগে আপনি মিঃ দুবের সঙ্গে আলাপ করলে পুলিশের সাহায্য পাবেন—অবশ্য যদি দরকার হয়।

কর্নেল বললেন—দেখা যাক। তবে আমার অবাক লাগছে কিশোরীবাবুর সৎ বোন আছে তা উনি কেন চেপে গেলেন?

অবিনাশবাবু হাসলেন।—কিশোরীবাবু উইলের কথাও চেপে গেছেন। আশ্চর্য!

আমি চমকে উঠে কর্নেলের দিকে তাকালাম। কর্নেল শুধু বললেন—হুঁ।

অবিনাশবাবু বললেন—অ্যাডভোকেট ব্রজেন রায়ের কাছে কথাপ্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলাম কিশোরীবাবু বাইজি মেয়েটাকে দোতলা বাড়িটা দিয়েছেন। আমি কিশোরীবাবুর কাছে কথাটা তুলিনি। ব্যাপারটা বড্ড বাজে। কিন্তু আমার কী করার আছে? আরও একটা কথা। কিশোরীবাবু জীবনে কারও পরামর্শে চলার মতো লোক নন। এমন গোঁয়ার মানুষ দেখা যায় না।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বললেন—এবার উঠি। আপনার কাছে কতকগুলো জরুরি পয়েন্ট জানা গেল। সেজন্য ধন্যবাদ।...

পশ্চিম গেটের কাছে যোগীন্দর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কর্নেল তার বাঁপাশে বসলেন। আমি পিছনে বসলাম। মাঝেমাঝে বাইনোকুলারে কর্নেল কী দেখছিলেন বুঝলাম না। এই শীতে পাখিরা কে কোথায় চুপচাপ বসে আছে। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে পুরনো পাথরের ব্রিজের ওপারে একটা গাছের ঝুঁকে-পড়া ডালে

মাছরাঙা জাতের একটা পাখি দেখলাম। তারপর গঙ্গার সমান্তরালে হাইওয়েতে যেতে যেতে দূরে কুয়াশার ফাঁকে জলহাঁসের একেকটা দলকে ধনুকের মতো বেঁকে নেমে আসতে দেখলাম।

বাজার পেরিয়ে গিয়ে একটা চৌমাথার পাশে কর্নেল যোগীন্দরকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। তারপর তার হাত জোর করে বকশিশ গুঁজে দিয়ে বললেন—চলি যোগীন্দর!

যোগীন্দর সেলাম দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। কর্নেল একটা সাইকেল রিকশো ডেকে বললেন—ভকিলসাব ব্রজেন রায়কা মকান যানে হোগা। মালুম হ্যায়!

রিকশোওয়ালা বলল—জরুর সাব! বৈঠিয়ে। দশ রূপৈয়া দেনা পড়ে!

—ঠিক হ্যায়। জলদি চলো!

রিকশোতে উঠে বললাম—ব্রজেনবাবু তো আপনাকে চেনেন না। পাত্তা দেবেন তো?

কর্নেল বললেন—গিয়েই দেখবে।

গোলকধাঁধার মতো গলিপথ ঘুরে অবশেষে যেখানে পৌঁছলাম, সেটা পরিচ্ছন্ন ভদ্র এলাকা। নতুন টাউনশিপ বলে মনে হলো। একটা বাড়ির গেটের সামনে রিকশো দাঁড়াল। আমরা নামলাম। কর্নেল ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বললেন—এস।

গেটে দারোয়ান নেই। ফাঁক হয়ে আছে। তার মধ্যে দিয়ে নানাশ্রেণীর লোক যাতায়াত করছে। বারান্দায় একদল দেহাতি লোক বসে আছে। বোঝা যায়, ব্রজেন রায়ের আদালতে নামডাক আছে। কর্নেলকে লক্ষ্য করে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বললেন—আপনি কি কর্নেলসায়েব? আসুন! সার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বারান্দার পর একটা অফিসঘর। তারপর অ্যাডভোকেটের চেম্বার। সেখানে ঢুকতেই কালো স্যুটটাই পরা ফর্সা মধ্যবয়সী একজন টেকো ভদ্রলোক সহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং কর্নেলের করমর্দন করে বললেন—অবিনাশ আপনার চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। বসুন কর্নেলসায়েব।

কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—আপনার কোর্টে যাওয়ার সময় হয়েছে হয়তো। তাই কথা শীগগির সেরে নিতে চাই। কথাগুলো গোপনীয়।

ব্রজেনবাবু সহাস্যে বললেন—জানি। কোনও অসুবিধে হবে না। তবে চা বলি। তারপর—

—ধন্যবাদ মিঃ রায়। আমরা চা খেয়েই বেরিয়েছি।

—আচ্ছা। পাশের ঘরে চলুন।

এই ঘরটাকে অ্যান্টি-চেম্বার বলা যায়। দামি সোফাসেট, দেয়ালে সুদৃশ্য পর্দা ইত্যাদি আছে। সেন্টারটেবিলে ফুলদানিতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ। অ্যাশট্রে টেনে নিয়ে কর্নেল নতুন করে চুরুট ধরালেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন—আপনি নিশ্চয় জানতেন না যে পাকুড়ে কিশোরীবাবুর এক বোন থাকেন?

ব্রজেনবাবু উত্তেজিতভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন—নেভার। কিশোরীকে তা হলে সতর্ক করে দিতাম। ওই বাড়ি আর বাগান জমিসমেত কিশোরীর বাবার সম্পত্তি। কিশোরী একতলা বাড়িকে দোতলা করেছিল এইমাত্র। যে ছোকরা কাল আমার কাছে হুমকি দিয়ে গেল, সে কিশোরীর সৎ বোন কমলার ছেলে। একেবারে গুণ্ডার মতো চেহারা। আমাকে শাসিয়ে গেল। বুঝুন!

—তার নাম বারীন রায়?

—আপনি কী করে জানলেন?

—কাল সন্ধ্যায় আপনি কিশোরীবাবুকে যখন ফোনে এই ব্যাপারটা জানাচ্ছিলেন, তখন আমি ওঁর কাছেই বসে ছিলাম। যাই হোক, বারীন কোন সূত্রে উইলের কথা জানতে পেরেছে, তা বলেনি?

—না। কিন্তু ওদের কেউ পাকুড়ে চিঠি লিখে হোক, যেভাবে হোক জানিয়েছে। কিশোরীর শত্রু এখানে অনেক। সারাজীবন তো ওর ঝুটঝামেলা করে কেটেছে। অনেকসময় আমার মনে হয়েছে, ও কী করছে তা জানে না। ব্রজেনবাবু চাপাস্বরে ফের বললেন—একটা বাইজি মেয়ে নিয়ে জমিদারবাড়ির খোকা বোসের সঙ্গে কী না করেছে! আপনি বিজ্ঞ মানুষ। সবই আশা করি বুঝে ফেলেছেন।

—উইলের কথা গোপন থাকেনি মনে হচ্ছে!

—তাই কি থাকে? তবে আমার ধারণা, কিশোরীর বাড়ি থেকেই রটে গেছে। গোবিন্দের বউকে নিশ্চয় দেখে থাকবেন।

—দেখেছি।

—গোবিন্দের চেয়ে তার রাগ বেশি। বাইজি একটা দোতলা বাড়ি পাবে? বুঝুন!

—হুঁ। বারীন এরপর কী করবে বলে আপনার ধারণা?

—কোনও অ্যাডভোকেটকে ধরবে, এ তো বোঝাই যায়। তাঁর পরামর্শমতো সে পাকুড় থেকে তার মাকে এনে কিশোরীর বাবা অতুলবাবুর প্রপার্টির শেয়ার দাবি করবে। কিশোরীর বরাতে খারাপ কিছু ঘটে গেলে ওর উইল প্রোবেট করার সময় বাধা পড়বে। এমনকি খারিজ হওয়াও অনিবার্য। কিশোরী আমাকে কথাটা জানালে ওকে অন্য পথ বলে দিতাম।

—কিশোরীবাবুর টেরিয়ার কুকুরটাকে গতরাতে কে গুলি করে মেরেছে!

—জানি। কুকুরটাকে যে-ই মারুক বা যে উদ্দেশ্যেই মারুক, কিশোরীর আপাতত এটা শাপে বর হয়েছে। কিছু মনে করবেন না কর্নেলসায়েব। আমার মক্কেল কিশোরী। তা ছাড়া আমার এই প্রোফেশনে এথিক্স মেনে চলি। ওকে সাহায্য করা দরকার। একটা ছুতো মিলেছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—অর্থাৎ পাকুড়ের কমলা দেবীর ছেলে বারীনকে দায়ী করার পরামর্শ দিয়েছেন।

অ্যাডভোকেট ভদ্রলোকও হাসলেন।—কর্নালসায়েব! কিশোরীর পাগলামির কথা জানি। হ্যাঁ, তার মাথায় অদ্ভুত সব ছিট-টিট আছে। কিন্তু সে জেদি। একবার ওর মাথায় একটা কিছু ঢুকলেই হলো। ব্যস!

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে শুধু আলাপ করতেই এসেছিলাম। আমার বন্ধু অবিনাশ রায়চৌধুরিও আপনার একজন ক্লায়েন্ট। তাই না?

—হ্যাঁ। অবিনাশ কিশোরীর ব্যাকগ্রাউন্ড আমার চেয়ে বেশি জানে।

—আচ্ছা, চলি। নমস্কার।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললাম—কিশোরীবাবু আপনাকে তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড সবটা জানাননি। একজন সৎ বোনের খবর পাওয়া গেল। এরপর আরও কিছু তথ্য বেরিয়ে পড়বে দেখবেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—বেরিয়ে পড়ার আগে আমাদের ব্রেকফাস্টপর্ব সেরে নিয়ে তৈরি থাকা উচিত। ওই দেখ, একটা রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। ভদ্র এরিয়ার রেস্তোরাঁ। আশা করি খাওয়াটাও ভদ্রোচিত হবে।...

রেস্তোরাঁটা প্রায় জনহীন। চাইনিজ ফুডও পাওয়া যায়। আমাদের অবশ্য টোস্ট ডিম দিয়ে পেট ভরাতে হলো। দ্রুত খাওয়ার পর রাস্তায় নেমে কর্নেল চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন। রাস্তায় হাঁটার সময় তিনি চুরুট টানেন না। জ্বলন্ত চুরুট থেকে নীল ধোঁয়া তাঁর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। একটু পরে একটা সাইকেল রিকশো ডেকে তিনি বললেন—পুলিশ স্টেশন!

রিকশোওয়ালা বলল—বিশ রুপৈয়া সাব! থানা পুরানা টৌনমে হ্যায়।

কর্নেল দরাদরি করলেন না। ঘড়ি দেখে রিকশোয় উঠে বসলেন। রিকশোওয়ালা সায়েব দেখে বেশি দর হেঁকেছিল তা বোঝা গেল। শর্টকাটে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই যেখানে পৌঁছলাম, সেটা সরকারি অফিসের এলাকা।

থানায় ঢুকে কর্নেল একজন কনস্টেবলকে বলে অফিসার-ইন-চার্জের খবর নিলেন। সে আঙুল দিয়ে একটা ঘর দেখিয়ে দিল। কর্নেল সেই ঘরে উঁকি দিতেই

ভরাট গলায় হরিপ্রসাদ দুবে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন। কর্নেল আমার পরিচয় দিলেন। মিঃ দুবে বাংলায় কথা বলছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি কলকাতায় ছিলেন। কাজেই বাংলা তিনি বাঙালির মতোই বলতে পারেন।

মিঃ দুবে এইসব কথার পর সোজা কিশোরীবাবুর প্রসঙ্গে এলেন। অবিনাশ রায়চৌধুরি তাঁকে কর্নেলের যা পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে মিঃ দুবে বুঝতে পারেননি, কেন মিঃ রায়চৌধুরির কলকাতার এক বন্ধু এই কর্নেলসায়েব কিশোরীবাবুর ব্যাপারে আগ্রহী। আমি ভাবছিলাম, কর্নেল এবার তাঁর তুরুপের তাস—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া গোপন পরিচয়পত্রটি দেখাবেন। ওতে 'টু হুম ইট মে কনসার্ন' শিরোনামে ভারতের সর্বত্র প্রশাসন এবং বিশেষ করে পুলিশকে ওঁর কাজে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু কর্নেল বললেন—কিশোরীমোহন ডাঁশ আমার সুপরিচিত। ক'দিন আগে কলকাতা গিয়ে উনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাঁকে উড়ো চিঠি লিখে কে প্রাণনাশের ভয় দেখাচ্ছে। পুলিশ নাকি এতে তত আগ্রহ দেখায়নি।

মিঃ দুবে একটু হেসে বললেন—কিশোরীবাবু বাড়িতে এক বাইজিকে এনে রেখেছেন। তাই তাঁর সঙ্গে কেউ তামাশা করছে। ওটা কোনও সিরিয়াস ব্যাপারই নয়।

—কিন্তু গত রাতে ওঁর টেরিয়ার কুকুরকে কে গুলি করে মেরেছে। আপনারা তো সেই কেস নিয়েছেন।

মিঃ দুবে আরও হেসে বললেন—কিশোরীবাবুর এক ভাগনে আছে। মামার প্রপার্টির দাবি করতে এসেছিল। মামা কাল ওকে বাড়ি ঢুকতে দেয়নি। কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। এটা তারই কাজ। তাকে আমরা একটা হোটেল থেকে ভোরে গ্রেফতার করেছি। পাকুড় পুলিশ স্টেশনে ফোন করে জানতে পেরেছি, পুলিশের ব্ল্যাকলিস্টে তার নাম আছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা করে বেড়ানো ওর পেশা।

—তার কাছে কোনও ফায়ার আর্মস পেয়েছেন কি?

—এখনও পাইনি। আমাদের সন্দেহ এখানে কোনও বন্ধু আছে তার। সেখানে চালান করে দিয়েছে। সকাল পর্যন্ত জেরা করেছি। এখনও কিছু স্বীকার করাতে পারিনি। তবে পারব। উল্টো করে ঝোলালে তখন কথা বেরিয়ে আসবে।

—তাকে কোর্টে হাজির করাবেন তো?

—দেখুন কর্নেলসায়েব! আপনি কিশোরীবাবুকে সাহায্য করতে এসেছেন। তার বদমাশ ভাগনের জন্য আপনি সিম্প্যাথি দেখাচ্ছেন। কেন তা জানা দরকার।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—কুকুরটার পোস্টমর্টেম করেছেন কি?

মিঃ দুবে চটে গেলেন।—কী বলছেন? কুকুরের পোস্টমর্টেম!

—এটা আইনের প্রশ্ন মিঃ দুবে। ধরুন, কিশোরীবাবুর ভাগনের ফায়ার আর্মস উদ্ধার করতে পারলেন। তারপর প্রমাণের প্রশ্ন উঠবে, ওই ফায়ার আর্মসের গুলি কুকুরের মাথায় ঢুকেছিল কি না।

মিঃ দুবে মেজাজ দেখিয়ে বললেন—আপনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে আমি বুঝতে পারছি না আপনার উদ্দেশ্য কী?

—মিঃ রায়চৌধুরি তো আপনাকে বলেছেন, আমি আপনার সহযোগিতা চাই।

—কী আশ্চর্য! আপনি কি কিশোরীবাবুর গুণ্ডা ভাগনেকে ছেড়ে দিতে বলছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—কুকুরটার পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি।

—ড্যাম ইট! আপনি কে মশাই যে আপনার কথা আমাকে মানতে হবে?

কর্নেল বুকপকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড বের করে দিয়ে বললেন—এটা রাখুন।

চণ্ডীহাটি থানার বড়বাবু নেমকার্ডটা দেখে বিড়বিড় করে আওড়ালেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। নেচারোলজিস্ট্। এটা রেখে আমি কী করব?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—পুলিশ সুপার অশোকনাথ পাণ্ডেকে টেলিফোন করে কার্ডে ছাপানো নামটা বলবেন। আচ্ছা চলি। নমস্কার!

মিঃ দুবের মুখ লাল হয়ে রইল। কর্নেল বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। থানার গেট পেরিয়ে গিয়ে বললাম—আপনার আইডেন্টিটি কার্ডটা দেখানে উচিত ছিল। লোকটা উদ্ধত প্রকৃতির।

কর্নেল হাসলেন।—ছেড়ে দাও! চলো এবার কিশোরীবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক।...

আবার সাইকেল রিকশোতে চেপে গঙ্গাতীরের হাইওয়ে দিয়ে এগিয়ে ডাইনে প্রাইভেট রোডের মোড়ে পৌঁছালাম। রিকশোওয়ালা বলল—সাব! ইঁহা পর উতার যাইয়ে। ডাঁশবাবুকা মকানতক ম্যয় নেহি যাউঙ্গা।

কালকের মতোই ব্যাপার। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আমবাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, সেইসময় দেখি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই হন্তদন্ত এগিয়ে আসছেন। কর্নেল দাঁড়লেন। হালদারমশাই কাছে এসে চাপাস্বরে বললেন—পুলিশ আইয়া কুত্তাটারে দেইখ্যা মাটিতে কবর দিতে কইছিল। কিন্তু তারে কোথায় কবর দিল খুঁজতাছি। গোবিন্দ বাড়িতে নাই। তার বউ কইল, সে-ও জানে না কইলাম, তা হইলে কে জানে? সে কইল, বাবু আর ওই মাইয়াটা বাইরে কোথায় কুত্তাটারে পুঁতছে। তারে বাড়ি পাহারা দিতে কইছিলেন কিশোরীবাবু। সে তাই বাড়িতে ছিল।

কর্নেল বললেন—তখন আপনি কি আবার শয্যাশায়ী হয়েছিলেন?

—হঃ তখনই কুকুরটারে পুঁতবে তা ক্যামনে জানব, কন কর্নেলস্যার!

—আপনি কি কুকুরটার কবর খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

—হঃ। কিশোরীবাবুরে সকালে জিগাইছিলাম। উনি কইলেন গঙ্গায় ফেলছি। তারপর কুসুমেরে জিগাইলাম, সে-ও কইল গঙ্গায় ফেলছি। কিন্তু যমুনা দেখছে কুসুমের হাতে একখান খন্তা ছিল। কিশোরীবাবুর কাঁধে বন্দুক ছিল। উনি কুত্তাটারে ল্যাজ ধইরা টানতে টানতে লইয়া যাইতাছেন। হেভি মিস্ট্রি।

এখান থেকে দোতলা বাড়িটা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। কর্নেল বললেন—আপনি ওই পুকুরের দক্ষিণে জমিদার বাড়ির ধ্বংস্তূপের মধ্যে কি খুঁজেছেন?

—খানিকটা খুঁজছি।

—আরও তন্ন তন্ন করে খুঁজুন। ওটা খুঁজে বের করা দরকার। আমরা কিশোরীবাবুর সঙ্গে ততক্ষণ কথাবার্তা বলি। খোঁজ পেলে আপনি মুখ বুজে থাকবেন। সময়মতো আমাকে জানাবেন।

গোয়েন্দাপ্রবর দ্রুত আমবাগানের ভিতর দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন।...

ছয়

কিশোরীবাবুর বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে দেখলাম, প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। গলায় ঝোলানো স্টেথিসকোপে এবং এক হাতে বাকসোগড়নের পেটমোটা ব্যাগ দেখেই বুঝলাম তিনি ডাক্তার। কর্নেলকে চাপাস্বরে বললাম—ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাটের সঙ্গে কিশোরীবাবুর আবার ভাব হয়ে গেছে দেখছি।

কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। ডাকলেন—কিশোরীবাবু!

কিশোরীবাবু ঘুরে আমাদের দেখেই এগিয়ে এসে গেটের তালা খুলে দিলেন। আজ তাঁর চেহারায় বিপর্যয়ের আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। তিনি বললেন—আসুন! একটু আগে অবিনাশবাবুকে ফোন করেছিলাম। উনি বললেন, আপনি বেরিয়েছেন। আলাপ করিয়ে দিই, ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট। চিত্ত! ইনিই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। অবিনাশবাবুর বন্ধু। আমার সঙ্গে ওঁর ফার্মের বাংলোতে আলাপ। কর্নেলসায়েবকে আমি আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে অনুরোধ করেছিলাম।

ডাক্তার বরাট ফর্সা ঢ্যাঙা মানুষ। একগাল হেসে কর্নেলের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—আলাপ করে খুশি হলাম। আপনার সঙ্গী ভদ্রলোকের পরিচয়?

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত চৌধুরি। কলকাতার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। অবিনাশবাবুর কীর্তিকলাপ দেখতে এসেছে আমার সঙ্গে।

—হ্যাঁ। তা অবিনাশবাবু এক কীর্তি করেছেন বটে। এই চোর-ডাকাতের

এলাকায় দাপটে কারবার করছেন। নমস্কার জয়ন্তবাবু! ফিরে গিয়ে লিখবেন বিহারে বাঙালির দাপট এখনও কমেনি। আচ্ছা! চলি কিশোরী! বেশি হাঁটাহাঁটি কোরো না! রাতের ধকল সামলে যে এখনও ফিট আছ, তা কিন্তু আমারই ট্রিটমেন্টের গুণে। ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। চলি কর্নেলসায়েব!

বলে ডাক্তার বরাট বেরিয়ে গেলেন। কিশোরীবাবু আবার ভেতর থেকে গেটে তালা আটকালেন। ফিরে এসে তিনি বললেন—গোবিন্দকে একটা কাজে পাঠিয়েছি। আসুন। আমরা ওপরে যাই। মোতি! তোর মাকে বল কফি করে দিয়ে যাবে।

কর্নেল বললেন—থাক। কফি খাবো না। কুকুরটা কোথায় মরে পড়েছিল, একবার দেখতে চাই।

—চলুন দেখাচ্ছি। এর পিছনে সাংঘাতিক চক্রান্ত আছে। কাল টেলিফোনে ব্রজেনদা পাকুড়ের এক বজ্জাত ছোকরার কথা বলেছিলেন। এ কাজ তারই।

—সে নাকি আপনার সৎবোনের ছেলে?

কিশোরীবাবু চমকে উঠে বললেন—কে বলল আপনাকে?

—ব্রজেনবাবুকে সেই ছোকরা বলেছে। আমি ব্রজেনবাবুর কাছে বারীন নামে ওই ছোকরার খোঁজে গিয়েছিলাম।

কিশোরীবাবু ছাতিমতলায় গিয়ে বললেন—পাকুড়ের এক বিধবা মহিলা গত বছর আমার কাছে এসে বলেছিল, সে নাকি আমার বাবার প্রথমপক্ষের সন্তান। আমি তো অবাক। বাবা কিংবা মায়ের কাছে কস্মিনকালে শুনিনি এমন কথা। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এটা গভীর চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। কোন এক কমলা রায় আমার সৎবোন হলে এতকাল সম্পত্তি দাবি করতে নিশ্চয় আসত। তার চেয়ে বড় কথা, তাকে আইনত প্রমাণ করতে হবে সবকিছু। এতদিন চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ গতকাল ছেলেকে আমার লইয়ারের কাছে পাঠিয়েছে। এটা চক্রান্ত নয়?

কর্নেল বললেন—উত্তেজিত হবেন না প্লিজ। শুনলাম, তাকে পুলিশ আপনার কুকুর টনিকে গুলি করে মারার কেসে গ্রেফতার করেছে।

—যা করার সব ব্রজেনদাকে করতে বলেছি। আসুন, কোথায় কুকুরটা মরে পড়েছিল দেখিয়ে দিই।

শিবমন্দিরের পিছনে ঝোপজঙ্গলের একটা অংশ দেখালেন তিনি। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল বললেন—কুকুরটাকে এখানে মারা হয়নি। তাকে মারার পর টেনে এনে এই ঝোপে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

কিশোরীবাবু বললেন—সে কী! পুলিশ তো তা বলেনি।

কর্নেল ঘুরে পাঁচিলের দিকে তাকালেন। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন—আগের রাত্রে যে পাঁচিলের ওপর দিয়ে আপনার বাড়িতে নেমেছিল, আপনি আবছা তাকে দেখতে পেয়ে গুলি করেছিলেন। সেই লোকটাই গত রাতে এসে কুকুরটাকে মেরেছে। পাঁচিলের এই জায়গাটায় বাইরে থেকে ওঠা এবং ভেতরে নামা সহজ।

—তা হলে কি আগের রাত্রে সে টনিকে মেরে ফেলার জন্যই এসেছিল?

—সম্ভবত তা-ই। তো টনির কবর দিলেন কোথায়?

কিশোরীবাবু আস্তে বললেন—কুসুম বলল ওকে গঙ্গায় ফেলে দিলে মুক্তি পাবে। তাই দুজনে ওকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এসেছি।

এতক্ষণে দেখলাম, কুসুমকুমারী তার ঘরে পূর্বে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—ডাক্তার বরাট এসেছিলেন কেন?

—আমি ডাকিনি। নিজেই এসেছিল। ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে টনির কথা বলছিলাম। ও বলছিল, বাড়িতে চোর-ডাকাত পড়তে পারে। সাবধানে থাকতে হবে আমাকে। ওকে আর পাত্তা দিচ্ছি না। সেটা টের পেয়ে গেছে। কিন্তু বড্ড গায়েপড়া লোক। আবোলতাবোল বকবক করছিল। কুসুমকে ডেকে জোক করছিল। কুসুম ঘর থেকে বেরোয়নি।

লক্ষ্য করছিলাম, কর্নেল কথা বলছেন এবং শুনছেন, কিন্তু তাঁর চোখ মাটির দিকে। ছাতিমগাছের তলা নগ্ন। ইতস্তত ঝরাপাতা ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ একখানে কর্নেল জুতোর ডগা দিয়ে কয়েকটা পাতা সরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—এই দেখুন। এখানে রক্তের ছোপ। পাতাগুলোর ওপর ছোপ শিশিরে ধুয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ—এখানেই টনির মাথায় গুলি করা হয়েছিল। অবশ্য আমি সিওর নই, ফায়ার আর্মসের গুলি নাকি ধারাল আর ভারী কিছু, অথবা—

কর্নেল হঠাৎ থেমে গেলেন। কিশোরীবাবু বললেন—আমি নিজে দেখেছি। মিঃ হালদার দেখেছেন। পুলিশ দেখেছে মাথায় গুলিরই ক্ষতচিহ্ন ছিল। মাথা থেকে কাঁধ আর গলা অবধি রক্ত মাখা ছিল। চুঁইয়ে পড়া রক্ত।

কর্নেল আস্তে বললেন—পাকুড়ের বারীনই কি পরপর দু'রাত্রি পাঁচিল ডিঙিয়ে টনিকে মারবার জন্য আপনার বাড়ি ঢুকেছিল? আপনার কী মনে হয়?

কিশোরীবাবু বাঁকা হেসে বললেন—নাঃ। ওই ছোকরার এ কাজ নয়। তবে ব্রজেনদা আইনজ্ঞ মানুষ। আপাতত তাকে ঠেকিয়েছে, পাছে আমার সঙ্গে ও এখানকার পরামর্শদাতাদের সাহায্য নিয়ে ঝামেলা বাধায়।

—বুঝলাম। তা হলে কে টনিকে মারল? কিশোরীবাবু গলার ভেতর বললেন—

কর্নেলসায়েব! আজ রাত তিনটে চল্লিশ মিনিটে আমার প্রাণ যাবে। তাই না?

কর্নেল হাসলেন।—সেইজন্য আপনার বাড়িতে নিঃশব্দে যাতে ঢোকা যায় সেই উদ্দেশ্যে কেউ কুকুরটাকে মেরেছে?

—তা-ই তো মনে হচ্ছে!

—কিন্তু আপনি ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ করে জেগে থাকুন বা ঘুমিয়ে পড়ুন, কেমন করে সে আপনাকে মারবে? তা ছাড়া মিঃ হালদারের মতো ধুরন্ধর এবং অভিজ্ঞ মানুষ আছেন বাড়িতে। আপনি চাইলে পুলিশ আজ সারারাত বাড়ির চারপাশে পাহারা দেবে। আমি আর জয়ন্তও থাকব।

কিশোরীবাবু ভুরু কুঁচকে তাঁর দোতলা ঘরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—এখনও অনেক সময় আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম কে সেই লোক অন্তত এটুকু খুঁজে বের করুন। এখন সাড়ে দশটা বাজে। আপনি কি তাকে খুঁজে পেয়েছেন?

কর্নেল পা বাড়ালেন। বললেন—না।

কিশোরীবাবু হতাশভাবে বললেন—একটু সূত্রও পাননি?

—সূত্র পাওয়া নির্ভর করছে আপনার ওপর।

—তার মানে? একটা লিস্ট তো আপনাকে দিয়েছি।

—দেখুন কিশোরীবাবু, অনেকসময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। এটা আপনার ক্ষেত্রেও সত্য। আপনি এমন কিছু জানেন, যা আমি জানতে পারলে আপনার শত্রুর খোঁজ পেতাম। কিন্তু আমার ধারণা, আপনি নিজেই জানেন না যে আপনি তেমন কিছু হয়তো জানেন।

—আমি কী জানি? যা জানি সব আপনাকে বলেছি। বরং আমাকে প্রশ্ন করুন।

—আপনি এবং কুসুম কুকুরটাকে ফেলতে যাওয়ার সময় খন্তা নিয়ে গিয়েছিলেন কি?

কিশোরীবাবু চমকে উঠলেন।—কে বলল?

—যে-ই বলুক, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

—হ্যাঁ। গঙ্গার বালিতে পুঁতে দেব এই উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কুসুম বলল, জলে ফেলে দিলে টনির আত্মার মুক্তি হবে।

—খন্তাটা?

ওটাও গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি। কিন্তু কেন এসব কথা জানতে চাইছেন?

—নিছক প্রশ্ন। খন্তাটা গঙ্গায় ফেললেন কেন?

কিশোরীবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি ফেলিনি! কুসুম ছুঁড়ে ফেলেছিল। সামান্য একটা খন্তার জন্য আমার কোনও আগ্রহ ছিল না।

ততক্ষণে আমরা গেটের পাশে একতলা ঘরগুলোর পাশে চলে এসেছি। হরগোবিন্দের বউ যমুনা মাথায় ঘোমটা দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মেয়ে কোথায়?

যমুনা মৃদুস্বরে বলল—ইস্কুলে যেতে দিইনি। তাই রাগ করে শুয়ে আছে।

—কোন ক্লাশে পড়ে তোমার মেয়ে?

—আজ্ঞে সার কেলাশ থিরি।

—এখানে বাংলা স্কুল আছে? নাকি ইংরেজি স্কুলে পড়ে?

কিশোরীবাবু বললেন—চণ্ডীহাটি বেঙ্গল ক্লাব একটা বাংলা স্কুল চালু করেছে। গোবিন্দ তার মেয়েকে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে ভর্তি করতে চেয়েছিল। আমি ওকে বাংলা স্কুলে ভর্তি করতে বলেছিলাম।

কর্নেল বারান্দায় উঠে গেলেন। আমি ও কিশোরীবাবু নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম কর্নেল ওপাশের ঘরের দরজায় উঁকি মেরে সহাস্যে বললেন—বাঃ! তুমি ইস্কুল ফাঁকি দিয়ে ঘরে বসে আছ। নাম কী তোমার?

যমুনা বলল—আজ্ঞে সার! ওর নাম সোনালি। ডাক নাম মোতি।

কর্নেল জুতো খুলে রেখে ঘরে ঢুকে গেলেন। কিশোরীবাবু হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন লক্ষ্য করে বললাম—কর্নেল ছোটদের খুব ভালবাসেন। তাদের জন্য পকেটে চকোলেট বা লজেন্স সব সময় রাখা থাকে।

কিশোরীবাবু বললেন—এক মিনিট! আমি আসছি!

বলে তিনি তাঁর দোতলা ঘরের নিচের বারান্দার গ্রিলের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। এই সুযোগে আমি যমুনাকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের কর্তাবাবুর দোতলার ঘরে ওঠার মুখে সিঁড়িতে দরজা আছে দেখেছি। ওখানেও কি বাবু সবসময় তালা এঁটে রাখেন?

যমুনা চাপাস্বরে বলল—বাবু যখন শুয়ে পড়েন, তখন ভিতর থেকে খিল আটকে দেন। বাইরে থেকে তালা কখনও-কখনও আঁটা থাকে। বাবু যখন বাইরে যান তখন।

—ওই মহিলা, কুসুমকুমারীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?

যমুনা বাঁকা মুখে বলল—দরকার না হলে আমি কথা বলি না। বাবু ওই এক সাপ পুষছেন। দুধকলা দিয়ে সাপ পোষার ফল সবে ফলতে শুরু করেছে।

—মহিলা সুন্দর গান করেন শুনেছি। যমুনা ফিসফিস করে বলল—বাইজি মেয়ে সার! খারপ মেয়ে। আমাদের বাবুর লাজলজ্জা বলে কিছু নেই। কী করব? এ বাড়িতে ওই পাপ আসবে জানলে—

শ্বাস ছেড়ে সে চুপ করল। বললাম—বাবু তো তোমাদের বাড়ির অর্ধেকটা

উইল করে দিয়েছেন।

—কানেই শুনেছি। মোতির বাবাকে কী বলব সার? সম্পত্তির লোভে এখানে পড়ে আছে।

—মোতির বাবাকে তোমার বাবু কোথায় পাঠিয়েছেন?

—পাকুড়। বাবুর সৎবোন বলে একজন বিধবা মেয়ে একবার এ বাড়িতে এসেছিল। বাবু তাকে পাত্তা দেননি। আজ অতসব কাণ্ডের পর বাবুর খেয়াল হয়েছে। মেয়েটার খোঁজখবর নিতে পাঠিয়েছেন। সার! বাবুকে যেন এসব কথা বলবেন না। খুব রাগী গোঁয়ার মানুষ উনি।

—না, না। তুমি ভেবো না।

এই সময় কর্নেল বেরিয়ে জুতো পরছিলেন। যমুনা ঘোমটা আরও বাড়িয়ে দিল। কর্নেল বারান্দা থেকে নেমে বললেন—যমুনা! তোমার মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী।

যমুনা বলল—আপনাদের আশীর্বাদ সার!

কর্নেল আমার কাছে এসে বললেন—কিশোরীবাবু কোথায়?

বললাম—ঘরে ঢুকেছেন। এখনই এসে পড়বেন।

কর্নেল যমুনার দিকে তাকালেন। আস্তে বললেন—তোমার স্বামী কি টনির মতোই সারারাত জেগে বাড়ি পাহারা দেয়?

যমুনা বলল—না সার! গত দু'রাত্তির বাবু ওকে জেগে থাকতে বলেছিলেন।

—গত রাতে কখন গোবিন্দ টনির খোঁজে বেরিয়েছিল?

—আমি ঘুমিয়েছিলাম। জানি না সার। হৈচৈ শুনে উঠলাম। তখন রাত্তির বেশি হয়নি। সবে খেয়ে শুয়েছি। আমাদের বাবু আর কলকাতার বাবুর খাবার মোতির বাবা পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

—তুমি দেখতে গিয়েছিলে টনিকে?

—যাচ্ছিলাম। মোতির বাবা ছাতিমতলা থেকে ধমক দিয়ে যেতে বারণ করল।

কিশোরীবাবু বেরিয়ে বারান্দার গ্রিলে তালা আঁটলেন। তারপর এগিয়ে এলেন। কর্নেল গেটের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন—এখন চলি কিশোরীবাবু! সময়মতো আবার আসব। মিঃ হালদার কোথায় গেলেন?

কিশোরীবাবু আড়ষ্টভাবে হাসলেন।—শিবমন্দিরের পিছনের দিকে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়েছেন। ওদিকে কী সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন কে জানে! আমি ওঁকে সতর্ক করে দিয়েছি। ওদিকে ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকে আমার শত্রুপক্ষের কেউ ওঁর ওপর হামলা করতে পারে।

—রমেন বোসের বাড়ি কি আপনার পুকুরের ওদিকে?

—ওদিকে পুরনো জমিদারবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। রমেনের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল

ওখানে। তার ঠাকুর্দা খানিকটা দূরে গঙ্গার ধারে বাড়ি করেছিলেন। রমেন সেখানে থাকে।

—আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে শর্টকাটে আপনার পুকুরপাড় হয়ে যাওয়া যায়। তাই না?

—আপনারা কি তার কাছে যেতে চান?

—চাই। কর্নেল হাসলেন।—আমার পরিচয় অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানী। ধ্বংসস্তূপে অর্কিড খুঁজতে বেরিয়েছি।

কিশোরীবাবু উদ্বিগ্নভাবে বললেন—খোকা মানে রমেন বোস প্রচণ্ড ধূর্ত। আপনি শর্টকাটে যেতে পারেন। তবে আমার বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন, এটা ওর লোকজনের চোখে পড়লে ঝামেলা হতে পারে।

কর্নেল বললেন—থাক। গঙ্গার ধারে হাইওয়ে হয়েই যাই।...

হাঁটতে হাঁটতে হাইওয়েতে পৌঁছে কর্নেল হঠাৎ উত্তরে গঙ্গামুখী হয়ে দাঁড়লেন এবং বাইনোকুলারে সম্ভবত জলহাঁস দেখতে থাকলেন। এ গঙ্গা বিশাল। মাঝেমাঝে ধু ধু বালির চর। কোনও চরে সবুজ রঙের ছাপ। জেলেদের নৌকো ভেসে বেড়াচ্ছে কাছে ও দূরে। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা চরে বসতি চোখে পড়ল। সম্ভবত অস্থায়ী বসতি। বর্ষায় গঙ্গার প্রবাহ বিহারের অন্যত্র দেখেছি। আদিগন্ত সমুদ্র হয়ে ওঠে।

ততক্ষণে গঙ্গার বুক ছুঁয়ে আসা ঠাণ্ডা হিম বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছে। কর্নেলের টুপি যে-কোনও মুহূর্তে উড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছিলাম। তাঁর সাদা দাড়ি দু'পাশে নাচতে শুরু করেছিল। বললাম—কর্নেল। রমেন বোসের বাড়ি যাবেন না?

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—কিশোরীবাবুর প্রিয় কুকুর টনিকে বালির চরে টেনে তুলে একদল শকুন মনের সুখে খাচ্ছে।

—বলেন কী? কোথায়?

কর্নেল বাইনোকুলার আমাকে দিয়ে বললেন—উত্তর-পূর্ব কোণে ঢেউখেলানো চরের নিচের দিকটা দেখ।

বাইনোকুলারে দৃশ্যটা দেখে বীভৎস মনে হলো। হতভাগ্য বিদেশি কুকুরটার হাড় নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে শকুনের পাল। নিচের জলে স্রোত আছে। বাইনোকুলার কর্নেলকে ফেরত দিয়ে বললাম—হালদারমশাইকে খামোকা ঝোপজঙ্গলে কবর খুঁজতে পাঠালেন কেন?

কর্নেল আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—চলো। রাস্তার ওপাশে যাই। প্রকাণ্ড ট্রাকগুলো যে-ভাবে যাতায়াত করছে, কখন ধাক্কা মেরে গঙ্গার খাদে ফেলে

দেবে।

গঙ্গার খাদের দিকটা পাথরে বাঁধানো। বললাম—টনিকে কিশোরীবাবুরা সম্ভবত গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। পাথরগুলো পিছল মনে হচ্ছে। জলে নামা যাবে না।

কর্নেল বললেন—দূরে একটা ঘাট দেখতে পাচ্ছি। রমেনবাবুর বাড়ি বোধ হয় ওখানে।

আমরা ডানদিকে আমবাগানের বেড়ার পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, হালদারমশাই হন্তদন্ত বেরিয়ে আসছেন আমবাগান থেকে। আমরা দাঁড়ালাম। তিনি বেড়া ডিঙিয়ে এসে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন—কুত্তাটারে জঙ্গলের মধ্যে পুঁতছে।

আমি চমকে উঠলাম। কর্নেল আস্তে বললেন—চলুন। অন্য কোনও পথে সেখানে যাই।...

সাত

আমরা হালদারমশাইকে অনুসরণ করলাম। আমবাগানটা এড়িয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢাকা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকলাম। কর্নেল দেখে নিলেন, কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে কি না। জঙ্গলের মধ্যে ঝরাপাতার স্তূপে সাবধানে পা ফেলে আমরা হাঁটছিলাম।

কিন্তু আমার মাথার ভিতরে প্রশ্নের মাছি ভনভন করছিল। কিশোরীবাবুকথিত সেই ডাঁশ বা নীল মাছিই বলা যায়। বাইনোকুলারে কর্নেল দূরের চরে যে জন্তুর মড়া একদল শকুনকে খেতে দেখেছেন এবং আমিও দেখেছি, সেই জন্তুটা কর্নেলের মতে কিশোরীবাবুর প্রিয় কুকুর টনি। এদিকে গোয়েন্দাপ্রবর আমাদের নিয়ে চলেছেন তারই কবর দেখাতে। কী করে উনি বুঝলেন ওটা টনির কবর?

ধ্বংসস্তূপ আর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে হালদারমশাই থমকে দাঁড়ালেন। চাপাস্বরে বললেন—একখান ডাল ভাইঙ্গ্যা চিহ্ন দিয়া রাখছিলাম। আপনারা এখানে একটু ওয়েট করুন। আমি দেখি, সেই ডালখান কোথায় পুঁতছি।

তিনি এদিকে-ওদিকে উঁকি দিয়ে দেখে ডানদিকে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কর্নেল ও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ধ্বংসস্তূপগুলো উঁচু এবং ঝোপগুলোও যথেষ্ট উঁচু। সহজে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। তবে সাবধানে পা না ফেললে ঝরাপাতার শব্দ হবে। তাই আমরা সতর্ক।

একটু পরে ডানদিকে ঝোপের ফাঁকে হালদারমশাইয়ের মুখ দেখা গেল। তিনি ইশারায় আমাদের ডাকলেন। সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে গুঁড়ি মেরে একটা ধ্বংসস্তূপের কাছে গেলাম। সেখানে খানিকটা জায়গা খুঁড়ে কেউ

বা কারা মাটি সমান করে দিয়েছে। হালদারমশাই চারদিক দেখে নিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলেন। ফিসফিস করে বললেন—দেখছেন? এইখানে কুত্তাটারে পুঁতছে। ক্যান এইখানে অরে পুঁতল?

কর্নেল পিঠেআঁটা কিটব্যাগ থেকে ওজনে ভারি এবং দেখতে কুকরির মতো একটা অস্ত্র বের করলেন। ওটা তাঁর ভাষায় 'জাঙ্গল-নাইফ'। ওটা দিয়ে জায়গাটা তিনি খুঁড়তে শুরু করলেন। হালদারমশাই এই সময় তাঁর রিভলভার বের করে পাহারা দিতে থাকলেন।

মাটিটা নরম। ইটের টুকরো প্রচুর। কর্নেল প্রায় ফুটদুয়েক মাটি সরানোর পর কোনও জন্তুর লাশ নয়, নকশা খোদাই করা কাঠের ছোট্ট বাকসের একটা অংশ দেখা গেল। কর্নেল তাঁর জাঙ্গল-নাইফ তলায় ভরে চাপ দিতেই বাকসোটা উঠে এল। হালদারমশাই অবাক হয়ে বলে উঠলেন—কী কাণ্ড! কুত্তার বদলে বাকসো! কে পুঁতল?

কর্নেল দ্রুত বাকসোর ধুলোমাটি ঝেড়ে কিটব্যাগে ঢোকালেন। বাকসোটা ইঞ্চি ছয়েক চওড়া এবং ইঞ্চি আটেক লম্বা। উচ্চতা ইঞ্চি তিনেক। কর্নেল মাটিটা আগের মতো ঠিকঠাক করে ফেললেন। এরপর কর্নেলের ইশারায় আমরা যে দিক থেকে এসেছিলাম, সেই দিকে সাবধানে পা ফেলে এবং কখনও গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম।

হাইওয়ের ধারে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে যে জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপ থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, সেই দিকটা কিছুক্ষণ দেখে নিলেন। হালদারমশাই তখনও হতবাক এবং উত্তেজিত। কর্নেল একটু হেসে বললেন—আপনি ধরেই নিয়েছিলেন—তা ছাড়া এটাই স্বাভাবিক যে কুকুরটাকে কবর দেওয়া হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কুকুরটার কবর খুঁজতে আপনি কেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন?

হালদারমশাই বললেন—কুত্তাটারে কেউ সত্যি গুলি করছিল, না অন্যভাবে মারছিল? কইবেন ক্যান এই চিন্তা আমার মাথায় আইছিল? কুত্তারে সত্যই গুলি করলে তার ফায়ার আর্মস আছে। তা হইলে ইচ্ছা করলেই সে শিবমন্দিরের পিছনে লুকাইয়া থাক্‌তে পারত। কুত্তারে প্রথমে মারত। তারপর ডাঁশবাবু আইতেন—নিশ্চয় আইয়া পড়তেন; কেডা টনিরে মারল! পাইত। আর ওনারেও সে গুলি করবার সুযোগ পাইত। আর একটা পয়েন্ট। তখন রাত্র দশটাও বাজে নাই। গুলির শব্দ কেউ শুনল না ক্যান?

—হ্যাঁ। আপনার খটকা লাগা স্বাভাবিক তবে টনির রক্ত আমি দেখেছি। তাকে কেউ গুলি করেই মেরেছিল। আপনি বললেন, গুলির শব্দ কেউ শোনেনি কেন। এর একশো একটা উত্তর দেওয়া যায়। যাই হোক, আপনার খটকা লেগেছিল,

এর সুফল আমরা পেয়েছি।

—হাতবাকসো লুকাইয়া রাখছিল কেউ। কী আছে ওটার মধ্যে?

—সুযোগমতো খুলে দেখা যাবে। ধৈর্য ধরে থাকুন।

আমি বললাম—কর্নেল! তখন আপনি কেন হালদারমশাইকে টনির কবর খুঁজতে তাগিদ দিয়েছিলেন।

কর্নেল আস্তে বললেন—আমার পয়েন্টটা আলাদা। থানায় মিঃ দুবেকে বারবার বলছিলাম, কুকুরটার পোস্টমর্টেম করা উচিত ছিল। আমি আসলে জানতে চাইছিলাম, গুলি পিস্তল, না রিভলভার, নাকি বন্দুকের। যাক গে, কুকুরটার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে। শকুনেরাও ওকে খেয়ে ফেলেছে।

—মাথাটা খেতে পারেনি। গুলি মাথার মধ্যে আটকে থাকতে পারে।

কর্নেল হাসলেন।—নাঃ জয়ন্ত। কুকুরের খুলি সংগ্রহের ইচ্ছা আমার নেই। মিঃ দুবে যদি এ বিষয়ে তৎপর হন, তাতে অবশ্য আমার বলার কিছু নেই। হালদারমশাই! আপনি কিশোরীবাবুর বাড়ি ফিরে গিয়ে ওঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখুন। বাইরের কেউ এলে তার পরিচয় জানতে চেষ্টা করবেন কিন্তু।

—করুম।

—একটা খালি রিকশো আছে। আমরা উঠে পড়ি..

গোয়েন্দাপ্রবর একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর হাঁটতে থাকলেন। আমরা সাইকেল রিকশোতে চেপে চণ্ডীহাটি জনপদের দিকে চললাম। বাজারের চৌরাস্তার কাছে রিকশো থেকে নেমে কর্নেল বললেন—ওই ওষুধের দোকানে গিয়ে মিঃ রায়চৌধুরিকে একটা টেলিফোন করা যাক। ওঁর বাংলোয় ফেরা দরকার। তুমি এখানে অপেক্ষা করো।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ফিরে এলেন। বললাম—পেলেন ওঁকে?

কর্নেল হাসলেন।—হ্যাঁ। মিঃ দুবে পুলিশজিপে ওঁর ওখানে আমার খোঁজে এইমাত্র গিয়েছিলেন। মিঃ রায়চৌধুরির গাড়ি নিয়ে যোগীন্দর আসছে। আমি কোথায় থাকছি, তা জানিয়ে দিয়েছি। কুইক! ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া যাক। কফি না পেলে অগত্যা চায়ের লিকার। মিঃ দুবের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে চাই। উনি হয়তো এখনই কিশোরীবাবুর বাড়ি যাবেন আমার খোঁজে।

রেস্তোরাঁটা আগেরটার মতো ছিমছাম নয়। তবে কফি আছে। পকৌড়া আছে। ভিড়ও আছে। সে-ভিড় তরুণ-তরুণীদের। রাস্তার ওপারে একটা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউশন দেখা যাচ্ছিল। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের আড্ডা দেওয়ার পক্ষে রেস্তোরাঁটা মন্দ না। অবশ্য প্রত্যেকে বারবার কর্নেলকে দেখছিল। বুঝলাম, বিদেশি ট্যুরিস্ট বলে ভুল করেছে।...

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে যোগীন্দরের গাড়ি এসে দাঁড়াল। কর্নেল দ্রুত বিল মিটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যোগীন্দর নেমে যথারীতি স্যালুট ঠুকে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমরা দুজনে পিছনে বসলাম। কর্নেল জানালার কাচ তুলে দিয়ে বললেন—বহত্ জাড়া যোগীন্দার!

—জি হাঁ কর্নিলসাব। যোগীন্দর সায় দিল।

অবিনাশবাবুর বাংলোয় পৌঁছাতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। তবে শাকিলমিয়াঁ তৈরি ছিল। সে কর্নেলসায়েবের মেজাজ-মর্জি ভালো জানে। অবিনাশবাবু দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছিলেন। বললেন—কর্নেলসায়েব দুবেজির কানে কী মন্ত্র ছুঁড়ে দিয়ে এসেছেন, ভদ্রলোক ব্যাকুলভাবে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এবার ওঁকে জানিয়ে দিই, আপনি ফিরেছেন।

কর্নেল হাসলেন।—বরং ফোনে আমি কথা বলব। ওঁকে একটা জরুরি কাজ দিতে ইচ্ছে করছে।

—উনি পুলিশসুপারের তাড়া খেয়েছেন। যা বলবেন, অমান্য করবেন বলে মনে হয় না।

—ওঁকে গঙ্গার একটা বালির চর থেকে শকুনের ভুক্তাবশেষ একটা মুণ্ডু এনে মর্গে পাঠাতে বলব।

—বলেন কী। কিসের মুণ্ডু?

—কিশোরীবাবুর কুকুর টনির মুণ্ডু। শকুনেরা মুণ্ডু কামড়ে খেতে পারেনি আশা করি।

অবিনাশবাবু হাসতে হাসতে বললেন—আপনার ক্রিয়াকলাপ বোঝা কঠিন।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—না মিঃ রায়চৌধুরী। এটা খুব জরুরি কাজ। আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

—চলুন তাহলে।

কর্নেল কিটব্যাগ, ক্যামেরা আর বাইনোকুলার গেস্টরুমের টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেলেন। আমি এতক্ষণে উত্তেজনায় অস্থির। কারুকার্যখচিত ছোট্ট কাঠের বাকসোটা কি কিশোরীবাবু আর কুসুমকুমারী ওই দুর্গম স্থানে পুঁতে রেখেছিলেন? নাকি অন্য কেউ? কী আছে ওতে?...

দেড়টা নাগাদ খাওয়াদাওয়ার পর অবিনাশবাবু কাঠগোলায় চলে গেলেন। কর্নেল আমাকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে বললেন। জানালায় পর্দা টানা ছিল। কর্নেল কিটব্যাগ থেকে এতক্ষণে সেই কাঠের বাকসোটা বের করে বললেন—হাতে সময় তত বেশি নেই। আমাদের আড়াইটের মধ্যে বেরুতে হবে। যোগীন্দর গাড়ি নিয়ে আমাদের কিশোরীবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেবে। এবার দেখা যাক, এই

বাকসোটাতে কী গুপ্তধন আছে।

খুদে বাকসোটাতে তালা আঁটা ছিল। কর্নেল কিটব্যাগ থেকে একটা হাতুড়ি আর ছোট্ট লোহার গোঁজ বের করে অনেক চেষ্টার পর তালা ভেঙে ফেললেন। ফিকে নীল পুরু কাগজের মোড়কে ভরা ছিল। মোড়কটা খুললে বেরিয়ে পড়ল ভাঁজ করা পুরনো আর জীর্ণ কিছু কাগজ। একটা পুরনো ফোটো। ফোটোতে সদ্য বিবাহিত এক তরুণ দম্পতিকে দেখতে পেলাম। কর্নেল সাবধানে একটা ভাঁজ-করা কাগজ খুললেন। দেখলাম, ওটা ইংরেজ আমলের স্ট্যাম্পপেপার। কর্নেল আতস কাচের সাহায্যে সেটা পড়ার পর একটু হেসে বললেন—কিশোরীবাবুর বাবা মণিমোহন ভাঁশের দলিল। রেজিস্টার্ড দলিল নয়। স্ত্রী সুধাময়ী ভাঁশকে চণ্ডীহাটির স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি দান করেছেন। জয়ন্ত! পাকুড়ের কমলা দেবী সুধাময়ীরই একমাত্র সন্তান।

এরপর কর্নেল একটা বিবর্ণ চিঠির ভাঁজ খুলে আতস কাচে চোখ বুলিয়ে বললেন—মণিমোহনবাবু একসময় পাকুড়ে থাকতেন। চিঠিটা পড়ে বুঝলাম, সুধাময়ীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং এই মহিলা কিশোরীবাবুর মা সুচরিতা দেবী। চিঠিটা তাঁকে লেখা। কোনও কারণে চিঠিটা পাঠানো হয়নি। কমলা সৎমায়ের কাছে থাকত। কিন্তু সৎমায়ের অত্যাচারে পাকুড়ে মামার বাড়ি চলে গিয়েছিল। মণিমোহনবাবু সরকারি চাকরি করতেন। তখন তিনি মোতিহারিতে ছিলেন। সুচরিতাকে ভর্ৎসনা করে ওই চিঠি লিখেছেন। বাড়ি ফিরে একটা ব্যবস্থা করবেন—তাও লিখেছেন। যাই হোক, একটা গোপন ব্যাকগ্রাউণ্ড পাওয়া গেল।

বললাম—কিন্তু কিশোরীবাবু এগুলো নষ্ট না করে জঙ্গলে পুঁতে রাখতে গেলেন কেন?

কর্নেল আর একটা চিঠি বের করে পড়ছিলেন। সেটা ভাঁজ করে রেখে বললেন—জয়ন্ত! এই বাকসোটা কিশোরীবাবু বা কুসুম পুঁতে রাখেনি। এই কাগজপত্রগুলো কিশোরীবাবুর হাতে পড়লে তা তখনই নষ্ট করে ফেলতেন। উইল রেজিস্টার্ড না হলেও আইনত কার্যকর। কিন্তু অসুবিধা এক্ষেত্রে আছে। কারণ একটা প্রায় ষাট বছর আগেকার উইল। তা হলেও এর মূল্য আছে।

—তা হলে এই বাকসোটা কার কাছে ছিল?

—যার কাছে ছিল, সে কোনও কারণে এটা গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্গম জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিল।

—কে সে?

—এখনও নিশ্চিত নই কে এটা পুঁতেছিল। কিন্তু আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিত, সে কিশোরীবাবুর বাবার এই উইলের কথা বলে কিশোরীবাবুকে ব্ল্যাকমেল করত।

একটু ভেবে নিয়ে বললাম—তা হলে চরমপত্র তারই লেখা।

—এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। ব্ল্যাকমেলার প্রাণনাশের হুমকি দেবে কেন? যে-হাঁস সোনার ডিম পাড়ছে, তাকে মেরে ফেলার মতো নির্বোধ হবে কেন সে?

কর্নেল কাগজপত্রগুলো সেই পুরু নীল কাগজে মুড়ে আগের মতো বাকসে ঢোকালেন। তারপর কিটব্যাগ থেকে শক্ত সুতো বের করে তালাভাঙা বাকসোটা বেঁধে আটকে রাখলেন। কিটব্যাগে সেটা তলার দিকে ঢুকিয়ে তিনি ঘড়ি দেখে বললেন—কিশোরীমোহন উঁশ আমাকে অনেক কিছু গোপন করেছেন।

একটু হেসে বললাম—আপনিও আমাকে একটা ব্যাপার গোপন করেছেন।

—বলো।

—গোবিন্দের মেয়ের ঘরে ঢুকে তাকে চকোলেট খাইয়ে কিছু কথা বের করেছেন।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন—করেছি। কী কথা বের করেছি, তোমার তা অনুমান করা সোজা।

—প্রথম পাঁচটা চিঠি তার হাতের লেখা! তাই না?

—বাঃ! তোমার বুদ্ধি খুলেছে।

—গোবিন্দ মেয়েকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে তার কর্তাবাবুকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। কারণ আপনারই মতে ওই পাঁচটা চিঠি কিশোরীবাবুর শত্রুপক্ষের নয়।

—হ্যাঁ। কর্নেল হাসলেন।—আমি মোতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা ডায়রিবই খুঁজছিলাম। সেটা দেওয়ালের তাকে অনেকগুলো পঞ্জিকার মধ্যে ঠাসা ছিল। দেখে নিলাম। কয়েকটা পাতা টেনে ছেঁড়া হয়েছিল। একই কাগজ।

—মোতিকে চিঠির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেননি কিছু?

—নাঃ। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তাকে শুধু জিজ্ঞেস করেছি, তোমাকে স্কুলে হাতের লেখা লেখায় না? সে তখনই তার খাতা দেখাল। একই হস্তাক্ষর! তবে বানানভুল তার পক্ষে স্বাভাবিক।

—সেই লাইনটা মনে পড়ছে। 'তারপর চিত্ত বলেছে সেটা হবে মৃত্যু।' এটা আপনার পাঠ।

—এ পয়েন্টটা এখনও স্পষ্ট নয় আমার কাছে। চিত্ত মানে, ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, চিত্তরঞ্জন বরাট কি গোবিন্দকে তেমন কিছু বলেছিলেন? সেটা হবে মৃত্যু। কোনটা? গোবিন্দ ফিরলে জানবার চেষ্টা করব। অবশ্য ডাক্তার বরাটের সঙ্গেও আলাপ করতে অসুবিধা নেই। দেখা যাক।

বলে কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চুরুট টানলেন। বুঝলাম, এই রহস্যের জট ছাড়াচ্ছেন। আমি একটু শয্যাশায়ী হওয়ার জন্য বিছানার দিকে পা

বাড়ালাম। অমনই কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন—চলো! বেরিয়ে পড়া যাক।...

কর্নেলের কথামতো যোগীন্দর আমাদের থানার সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। এবেলা থানার গেটে দেখলাম, দুজন পুলিশ অফিসার কর্নেলের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ দুবের ঘরে নিয়ে গেলেন। মিঃ দুবে করজোড়ে নমস্কার করে বললেন—যদি কোনও ত্রুটি ঘটে থাকে, ক্ষমা করে দেবেন কর্নেলসায়েব! তখনই যদি আপনি আমাকে জানাতেন, অকারণ ভুল বোঝাবুঝি হতো না। আমি—

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ও সব কথা থাক মিঃ দুবে। কুকুরের মুণ্ডুটার খবর বলুন।

মিঃ দুবে বললেন—ওটা উদ্ধার করে হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়েছিলাম। ডাক্তার নরেশ শর্মা কুকুরটার কপালে একটা ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কোনও বুলেটনেল পাননি। শকুনের পাল মাথার ভেতরটা পরিষ্কার করে ফেলেছে। তবে ডাক্তার শর্মার মতে, কুকুরটাকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল। তা ছাড়া বুলেটনেল খুঁজে পেলেও ব্যালিস্টিক মিসাইল এক্সপার্ট তো চণ্ডীহাটিতে নেই। পরীক্ষার জন্য পাটনা পাঠাতে হতো।

—এ থেকে কি আপনার মনে হয় না যে লোকটা গুলি করেছিল, কুকুরটা তাকে চেনে?

—নিশ্চয় চিনত। তা না হলে শিক্ষিত টেরিয়ার তাকে কাছে আসতে দেবে কেন?

—একটা কথা জানতে চাই। ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাটের কি লাইসেন্সড্ ফায়ার আর্মস আছে?

মিঃ দুবের চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে উঠল। একটু পরে বললেন—আপনি নিশ্চয় জানেন, বিহার স্টেটে লাইসেন্সড ফায়ার আর্মসের সংখ্যা দেশের সব স্টেটের চেয়ে বেশি। আর চোরা অস্ত্রের সংখ্যা—একেবারে অত্যাধুনিক ফায়ার আর্মসের সংখ্যা যে কত, তার সঠিক হিসেব আমরা দিতে পারব না।

—ডাক্তার বরাটের কথা বলুন।

—ওঁর একটা বন্দুক আছে।

—কিশোরীবাবুরও বন্দুক আছে দেখেছি।

—গতবছর কিশোরীবাবু একটা সিক্স-রাউন্ডার রিভলভারেরও লাইসেন্স নিয়েছেন।

—এবার বলুন, পাকুড়ের বারীনের খবর কী?

—কোর্টে হাজির করিয়েছিলাম। সে এখন আমাদের হাজতে আছে।

—তার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ কী?

মিঃ দুবে হাসলেন।—মূল অভিযোগ এবার খুলে বলি। অ্যাডভোকেট ব্রজেনবাবুকে সে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল। কিশোরীবাবুর উইলের জন্য তিনিই নাকি দায়ী। এদিকে কিশোরীবাবুকে অভিযোগ, বারীনই তাঁর কুকুরকে গতরাতে গুলি করে মেরেছে।

—আমি বারীনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—আগে কফি-টফি খেয়ে নিন স্যার। তারপর ওকে এঘরেই আনতে বলছি।

—প্লিজ মিঃ দুবে! কফি নয়। আমার হাতে সময় কম। বারীনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ দুবের হুকুমে দুজন কনস্টেবল এক যুবককে নিয়ে এল। তার বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে। চেহারায় রুক্ষতা আছে। কর্নেল তাকে বসতে বললেন। কিন্তু সে বসল না। কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—সুধাময়ী নামে কাকেও চেনো তুমি?

বারীন বলল।—চিনি। তবে তাঁকে দেখিনি। আমার দিদিমা ছিলেন।

—তোমার মা কিশোরীবাবুর সম্পত্তির মালিক, একথা তোমাকে কে বলেছে?

—আমার মা বলেছে। মা কিশোরীবাবুর সৎ দিদি।

—এতদিন তোমার মা সম্পত্তি দাবি করেননি কেন?

—মা জানত না চণ্ডীহাটিতে সে দাদুর সব সম্পত্তির মালিক। গত বছর দাদুর উইলের জেরক্স কপি মায়ের হাতে দিয়ে আসে একটা লোক। তাকে মা চেনে। আমার সঙ্গে মা-ও এসেছে। মা আমার সঙ্গে হোটেলে ছিল। আজ ভোরে সেই লোকটা মাকে ডেকে নিয়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পরে পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করেছিল।...

আট

কর্নেল বললেন—আমার প্রশ্ন করার আর কিছু নেই।

মিঃ দুবের কথায় কনস্টেবলরা বারীনকে হাজত ঘরে নিয়ে গেল। তারপর মিঃ দুবে বললেন—এই কথাগুলো কোর্টেও বলেছে আসামি। এখন বুঝলাম, আপনি ব্যাক-গ্রাউন্ডটা জানেন। কিন্তু বারীনের মা কার সঙ্গে কোথায় গেছে, ওকে জেরা করেও জানতে পারিনি। বারীন বলছে, লোকটাকে সে চেনে না। তার মা চেনে। বড্ড গোলমেলে ব্যাপার।

কর্নেল ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন।—আপনাকে সময়মতো টেলিফোন করব। আপনার সহযোগিতা ছাড়া এই গোলমেলে ব্যাপারের মীমাংসা করা যাবে না।

মিঃ দুবে সহাস্যে বললেন—আপনাকে সহযোগিতার ত্রুটি ঘটবে না। দৈবাৎ

আমি অফিসে না থাকলে অ্যাডিশনাল ওসি মিঃ প্রকাশ যাদবকে পাবেন। এক মিনিট স্যার! আমি মিঃ যাদবকে খবর দিই।

প্রকাশ যাদবকে ডেকে কর্নেল ও আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মিঃ দুবে। দেখলাম, মিঃ যাদবও ইতিমধ্যে কর্নেলের পরিচয়—পুলিশ সুপারের নির্দেশও বলা চলে, পেয়ে গেছেন। দুজনে থানার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন আমাদের। গাড়ির দরকার কিনা, তাও জানতে চাইলেন। কর্নেল বললেন—আপাতত গাড়ির দরকার নেই আমার। চণ্ডীহাটিতে সাইকেলরিকশা প্রচুর। অসুবিধে হবে না।...

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললাম—কমলা দেবীর পিছনের সহৃদয় লোকটি কে হতে পারে ভেবেছেন?

কর্নেল আমার কথার উত্তর দিলেন না। বললেন—জয়ন্ত! কেউ যদি কোনও ব্যাপারে আমার সাহায্য চায়, কিন্তু আমাকে সব কথা খুলে না বলে, তা হলে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমার সাহায্যপ্রার্থী আমাকে বিভ্রান্ত করলে তার ছায়া মাড়াতে আর ইচ্ছে করে না।

—কর্নেল! আপনাকে এযাবৎ কোনও কেসে এমন ক্রুদ্ধ হতে দেখিনি।

কর্নেল আমার কথা শুনে হেসে ফেললেন।—না জয়ন্ত! আমি ক্রুদ্ধ হইনি। কথাগুলো আমার আক্ষেপ বলেই ধরে নিতে পারো। কিশোরীবাবু ছিটগ্রস্ত বলে পরিচিত। আমার এখন মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাস প্রবল। তাই নিজে যা কিছু করেন, তার পরিণাম চিন্তা করেন না।

হাসতে হাসতে বললাম—পদবি ডাঁশ কথাটা উল্লেখ করে উনি নিজেকে নীল মাছি বলছিলেন। বিষাক্ত নীল মাছি!

কর্নেল একটা সাইকেলরিকশো ডেকে বললেন—ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাটের বাড়ি চেনো?

রিকশোওয়ালা বলল—উনকা মকান নয়া টৌনমে। লেকিন উনকা দাওয়াখানা পুরানা টৌনমে হ্যায় সার! চার-সাওয়া চার ঘড়িমে উনকো দাওয়াখানামে দরশন মিলে গা!

কর্নেল বললেন—আভি সাড়ে তিন বাজা। উনকি মকানমে চলো।

নিউটাউনশিপে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। ছিমছাম দোতলা বাড়ি। সুদৃশ্য ফুলবাগান আর লন। রিকশোর ভাড়া মিটিয়ে কর্নেল গেটের সামনে যেতেই একটা লোক পাশের একতলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।—বলিয়ে সাব!

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড তাকে দিয়ে বললেন—ডাগদারসাবকা সাথ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হ্যায়।

—জেরা ঠারিয়ে সাব।

বলে লোকটি চলে গেল। তার দু'মিনিটের মধ্যে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ডাক্তার বরাট এগিয়ে এলেন।—নমস্কার কর্নেলসায়েব। কী সৌভাগ্য! আসুন! আসুন!

আমার মনে হলো, ভদ্রলোক কোনও সূত্রে কর্নেলের পরিচয় পেয়েছেন। তিনি সুসজ্জিত একটা ঘরে আমাদের বসিয়ে বললেন—শীতের বিকেলে কফিই ভালো। এক মিনিট।

কর্নেল বললেন—কফি খাওয়ার সময় নেই ডাক্তার বরাট। দুটো কথা বলেই চলে যাব।

ডাক্তার বরাট একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—কিশোরীমোহন ডাঁশের ব্যাপারে কি?

—ঠিক ধরেছেন।

—বলুন।

কর্নেল মুখে হাসি এনে বললেন—কিশোরীবাবুর সঙ্গে আপনার অনেকদিনের বন্ধুত্ব আছে। আবার তাঁর অসুখ হলে আপনিই তাঁর চিকিৎসা করেন শুনেছি। আমি জানতে চাই, তাঁর কি কোনও সিরিয়াস অসুখ-বিসুখ আছে?

ডাক্তার বরাট কর্নেলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন—ওর শারীরিক অসুখ তত কিছু নেই। অন্তত মারাত্মক কিছু নেই। ওর যা অসুখ, তা মূলত মানসিক। আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই। ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার দেখাতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। দেখায়নি। আমি যতটা বুঝেছি, কিশোরীর মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্পিলট পার্সোনালিটি। অনেকসময় সে কী করছে, তা সে নিজেই জানে না। একদিকে সে প্রচণ্ড সন্দেহপ্রবণ। অন্যদিকে যাকে বিশ্বাস করে তাকে খুবই বিশ্বাস করে। এছাড়া একটা ফোবিয়ার লক্ষণ সম্প্রতি দেখেছি। মৃত্যুভয়। কিশোরীর যৌবনে নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছিল, যার প্রতিক্রিয়া তার অবচেতনায় ভাইরাসের মতো বাড়তে বাড়তে এই অবস্থায় পৌঁছেছে।

—ওঁর স্ত্রীর আত্মহত্যার কথা জানি।

—জানেন? সেটাও কারণ হতে পারে।

—ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কে নাকি ওঁর স্ত্রীকে রেললাইনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে খুনই করেছিল।

ডাক্তার বরাট হাসলেন।—খোকা বোস সম্পর্কে ওঁর এই সন্দেহটা থেকে গেছে এখনও। খুলে বলি শুনুন! খোকা বোস আমাদের দুজনেরই বন্ধু ছিল। খোকা জমিদারবংশের লোক। তার মধ্যে এক সময় পঞ্চমকার-দোষ ছিল। যে বাইজি মেয়েটিকে কিশোরী আশ্রয় দিয়েছে—

কর্নেল বললেন—জানি। এবার আপনাকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করে বিদায় নেব।

ডাক্তার বরাট আবার গম্ভীর হলেন।—বলুন।

—কিশোরীবাবুর রেজিস্টার্ড উইলের অন্যতম সাক্ষী আপনি।

—হ্যাঁ। বন্ধুত্বের খাতিরে সই করেছি।

—এবার একটু ভেবে উত্তর দিন। আপনি কি সম্প্রতি কোনও সময়ে কিশোরীবাবু সম্পর্কে এমন কোনও কথা বলেছেন—কথাটা উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখছি ঃ 'সেটা হবে তার মৃত্যু'?

—আমি কাকেও বলেছি 'সেটা হবে তার মৃত্যু'?

—হ্যাঁ! এখানে 'তার' মানে কিশোরীবাবুর।

ডাক্তার বরাটের মুখে উত্তেজনার ছাপ পড়েছিল। একটু পরে বললেন—বলে থাকতেও পারি। কারণ কিশোরী অনেক সময় আমার প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ খায় না। সেই কারণেই কথার ছলে ওরকম কথা বলতেই পারি। হয় তো বলেছি, এই ওষুধটা ঠিকমতো না খেলে ঠিক মারা পড়বে। সেই কথাটাই কেউ অন্যভাবে বলছে। এই কোটেশনটা আপনি কোথায় পেলেন?

—কিশোরীবাবুর লেটার বক্সে পাওয়া উড়ো চিঠিতে।

ডাক্তার বরাট রুষ্ট হয়ে বললেন—উড়ো চিঠি? তার মানে, কেউ আমার নামে কিশোরীকে সতর্ক করে দিয়েছে?

—আপনি বুদ্ধিমান।

—ও মাই গড! বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি কিশোরী কলকাতা থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ আনিয়েছে।

—আমি ডিটেকটিভ নই। কেউ আমাকে কথাটা বললে অফেন্স নিই। কারণ বাংলায় টিকটিকি কথাটা এসেছে ডিটেকটিভ থেকে।

—তা হলে কিশোরীর ব্যাপারে আপনার কেন মাথাব্যথা কর্নেল সরকার?

—তিনি নাকি উড়ো চিঠি পেয়েছেন, আজ রাত তিনটে চল্লিশ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হবে। তাই উনি আমার সাহায্য চেয়েছেন। আপনি তাঁর চিকিৎসা করেন। তাই আমার জানার ইচ্ছে, ওঁর কোনও মারাত্মক অসুখ আছে কি না।

কর্নেল উঠে দাঁড়লেন। আমিও দরজার দিকে পা বাড়ালাম। ডাক্তার বরাট উত্তেজিতভাবে বললেন—কিশোরী মানসিক রোগী। সে হয়তো পাগল হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। খোকা বোসের চেয়ে সে অসৎ। আপনি জানেন না এখানকার সবাই কিশোরীকে কী ঘৃণা করে।

কর্নেল পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন।—আপনি চেম্বারে রাত্রে কতক্ষণ রোগী দেখেন?

—কোনও ঠিক নেই। দশ থেকে এগারোটাও বেজে যায়। কেন একথা জিজ্ঞেস

করছেন?

—নিছক প্রশ্ন। তারপর কি সোজা বাড়ি ফিরে আসেন? নাকি কোথাও আড্ডা দিয়ে ফেরেন?

—বেঙ্গল ক্লাবে গিয়ে সে খবর জেনে নিতে পারেন। এই প্রশ্ন অপমানজনক।

—নিছক প্রশ্ন। আচ্ছা, চলি।

ডাক্তার বরাট ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার মনে হলো, কেন যেন উনি হঠাৎ ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গিয়েছেন।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল বললেন—বারীনের মা কমলাদেবীকে খুঁজে বের করা দরকার। মহিলার আশ্রয়দাতা কে হতে পারেন?

বললাম—খড়ের গাদায় সূচ খুঁজে পাওয়ার মতো ব্যাপার।

কর্নেল একটা খালি সাইকেলরিকশো ডেকে বললেন—পুরানা টোনকি চৌরাস্তা।

রিকশোয় চেপে জিজ্ঞেস করলাম—ওখানে কার কাছে যাবেন?

—সেই ওষুধের দোকান থেকে একটা টেলিফোন করব।

দিনের আলো যত কমে আসছে, শীত তত জোরালো হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তাতে অভ্যস্ত। অনেকে হাতকাটা সোয়েটার গায়ে এবং মাথায় মাফলার জড়িয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। চৌরাস্তায় এ বেলা ভিড়টা বেশি। আমাকে ফুটপাতে দাঁড়াতে বলে কর্নেল ওষুধের দোকানে ঢুকলেন।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার উল্টোদিকে শাকসবজি মাছ-মাংসের বাজার। হঠাৎ চোখে পড়ল প্রৌঢ়া বাইজি কুসুমকুমারী বাজার থেকে বেরিয়ে একটা সাইকেলরিকশোতে উঠল। তার হাতে বাজারের থলে। সেজেগুজে টিপ পরে সে বাজার করতে এসেছিল। বিকেলের রক্তিম রোদে তার শাড়ি-ব্লাউজের ওপর ফিকে নীল পুলওভার এবং চেহারা দেখে মহানগরীর অভিজাত পরিবারের উগ্র আধুনিকা মহিলা বলে মনে হলো। কলকাতায় হয়তো তাকে এভাবে চোখে পড়ত না। বিহারের একটা মফঃস্বল শহরে সহজেই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লক্ষ্য করলাম, দোকানদার, খদ্দের আর কিছু মানুষ তার সম্পর্কে কিছু বলাবলি করছে। এটা স্বাভাবিক। তবে কোনও বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করলাম না। সম্ভবত কুসুমকুমারীর অতীত জীবন সম্পর্কে এখানকার লোকের মোহ আছে।

কর্নেল ওষুধের দোকান থেকে নেমে এসে বললেন—তুমিও হালদারমশাইয়ের মতো কুসুমকুমারীর প্রেমে পড়ে গেলে নাকি জয়ন্ত?

হেসে ফেললাম।—আপনার মতো বৃদ্ধ ব্যাচেলারের দৃষ্টি যে আকর্ষণ করতে পেরেছে, তার মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে।

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—অবশ্যই আছে। না থাকলে তুমি হালদারমশাইকে

মিস করতে না।

বললাম—কোথায় তিনি?

আমার পিছন থেকে হালদারমশাই চাপাস্বরে বলে উঠলেন—আমি জয়ন্তবাবুর পিছে খাড়াইয়া আছি, ওনার চক্ষু অইন্যদিকে।

ঘুরে দেখি, গোয়ান্দাপ্রবরের মাথায় মুসলমানি টুপি, গায়ে তুলোর কম্বল জড়ানো, পরনে লুঙি আর পায়ে যেমন তেমন চপ্পল—মুখে বেজায় দাড়ি। বেশি দাড়ির জন্য ওঁর দুদিকে সূচালো সূক্ষ্ম গোঁফের ডগা ঢাকা পড়েছে। নিখুঁত ছদ্মবেশ।

কর্নেল বললেন—চলো জয়ন্ত! হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে হাইওয়ে পর্যন্ত যাই। কফির তৃষ্ণা প্রখর হলেও একটু ধৈর্য ধরতেই হবে।

হাইওয়েতে পৌঁছে দিনশেষের ধূসর আলোয় দ্রুতগামী যানবাহনের চাকার ধুলো থেকে বাঁচতে কর্নেল ও আমি গঙ্গার তীরে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরে ছদ্মবেশী প্রাইভেট ডিটেকটিভ এসে গেলেন। ভাঙনরোধী গাছের জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে তিনি দ্রুত পোশাক বদলে প্যান্টশার্ট সোয়েটার পরে নিলেন। তাঁর ব্যাগের মধ্যে ছদ্মবেশ লুকিয়ে ফেলেছেন। রুমালে দুই গাল আর চিবুক ঘষার পর তিনি বললেন—নাঃ! মুখ ধোওয়া দরকার। আপনারা চলেন। আমি ওই ঘাটে যাই।

কিছুক্ষণ পরে হালদারমশাই ফিরে এলেন। কর্নেল বললেন—আপনি কি কুসুমকুমারীকে ফলো করেছিলেন?

হালদারমশাই বললেন—হঃ। সে আমবাগানের মোড়ে আইয়া রিকশো ধরল। আমি রেডি ছিলাম। আমিও একখান রিকশো ধরলাম।

—আপনি আগেই জানতে পেরেছিলেন ও বেরোবে?

—হঃ। তাই আমবাগানে ওত পাতছিলাম।

—তারপর?

—বাজারের কাছে সে নামল। আমি উল্টাদিকে নামলাম। একজন লোক খাড়াইয়া ছিল। অরে দেইখ্যা কাছে গেল। দুইজনে কিছু কথাবার্তা হইল। তারপর লোকটা কুসুমেরে কী একটা দিল। কুসুম তা বাজারের ব্যাগে ভরল। একটা কিছু যে দিল, তাতে আমি সিওর। কিন্তু জিনিসটা দেখি নাই। আমি প্ল্যান করছিলাম নির্জন রাস্তায় ব্যাগখান ছিনতাই করুম। ক্যান কী—আলো কম। বেজায় ধুলা উড়তাছে। কিন্তু হঠাৎ আপনাগো দেইখ্যা প্ল্যান ক্যানসেল করলাম।

কর্নেল হাসলেন।—ছিনতাই না করে ঠিক করেছেন। হালদারমশাই! কখনো এধরনের কোনও হঠকারিতা করে ফেলবেন না আমাদের সাবধানে এগোতে হবে।

—ঠিক কইছেন। তবে ছিনতাই করুম কি না ফাইনাল কিছু ঠিক করি নাই। বলা যায় না, মাইয়াটার কাছে ফায়ার আর্মস থাকলেও থাকতে পারে। জাস্ট প্ল্যান

করতাছিলাম!

—সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে ওবাড়িতে?

—তেমন কিছু চোখে পড়ে নাই।

—গোবিন্দ ফিরেছে?

—না। আমি কুসুমেরে ফলো করতে থাকাইছিলাম, তখন প্রায় আড়াইটা বাজে। এরপর গোবিন্দ ফিরছে কি না জানি না।

—যেখানে বাকসোটা পোঁতা ছিল, সেখানে কি আর লক্ষ্য রেখেছিলেন? হালদারমশাই দাঁড়িয়ে গেলেন।—কইতে ভুলছি। সেটাই তো হেভি খবর।

—বলুন!

—মোতির মা গাইগরু বাঁধতে গিছল পুকুরপাড়ে। তারপর দেখি, সে জমিদারবাড়ির জঙ্গলে ঢুকল। তারে ফলো করলাম। সে সেই গর্তের কাছে গেল। কী য্যান দেখল। তারপর এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরল। কর্নেলস্যার! বাকসোখান গোবিন্দই পুঁতছে।

—আমার অনুমান সত্য হলো। কিশোরীবাবুকে সম্ভবত তাঁর বাবার উইলের কথা উল্লেখ করে গোবিন্দ ব্ল্যাকমেল করেছে। তাই একতলা ঘরগুলো থেকে শিবমন্দির পর্যন্ত তাকে দান করে কিশোরীবাবু তার মুখ বন্ধ করেছেন। কিশোরীবাবুকে চাপে রাখবার জন্য গোবিন্দই সেই উইলের জেরক্স কপি পাকুড়ে কমলাদেবীর কাছে পাঠিয়েছে।

বললাম—কিন্তু পাঁচখানা চিঠি সে মেয়েকে দিয়ে লিখিয়ে কিশোরীবাবুকে সতর্ক করল কেন? কিশোরীবাবুর মৃত্যু হলে গোবিন্দেরই লাভ। আবার কমলাদেবীর দিক থেকেও গোবিন্দের বিপদ আছে। কাজেই তাঁকেই বা পুরনো উইলের জেরক্স কপি সে পাঠাবে কেন?

কর্নেল বললেন—কিশোরীবাবুর হঠাৎ অপমৃত্যু হলে গোবিন্দের উপর পুলিশের সন্দেহ পড়ত। কুসুমের উপর সন্দেহ হলেও চণ্ডীহাটিতে তার মাথা বাঁচানোর লোক আছে, গোবিন্দ তা জানত। তাই সে কিশোরীবাবুকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। অবশ্য এগুলো এখন আমার অনুমান। অঙ্ক বলতেও পারো। যখন দেখব, অন্য কোনও তথ্য এসে অঙ্কটাকে ভুল সাব্যস্ত করছে, তখন নতুন অঙ্ক কষব।

আমরা গঙ্গাতীরে হাইওয়ের উত্তর প্রান্তে পাথরে বাঁধানো অংশের উপর দিয়ে হাঁটছিলাম। স্থানে-স্থানে পাথরের ফাঁকে ভাঙনরোধী গাছের জঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে বললাম—আমরা কি কিশোরীবাবুর বাড়ি যাচ্ছি?

কর্নেল বললেন—তা ছাড়া আর যাব কোন চুলোয়? যমুনা কফিটা ভালোই তৈরি করে।

—আপনি কি কিশোরীবাবুকে ফোন করে এলেন তাহলে?

—কিশোরীবাবুর লইয়ার ব্রজেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, পাকুড়ের কমলাদেবীর সঙ্গে আজ তাঁর দেখা হয়েছে কি না। তবে পথে এসব কথাবার্তা আর নয়। এখন কফির তৃষ্ণায় আমি ছটফট করছি।...

কিশোরীবাবুর আমবাগানের পাশে তাঁর প্রাইভেট রোড ধরে হেঁটে যখন তাঁর বাড়ির গেটে পৌছুলাম, তখন পৌনে পাঁচটা বাজে। আবছা আঁধার ঘনিয়েছে চারদিকে। গা ছমছম করছিল অজ্ঞাত আশঙ্কায়। তবে গেটের শীর্ষে উজ্জ্বল আলো ছিল। বাড়ির ভিতরেও আজ সন্ধ্যায় উজ্জ্বল আলো ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে দোতলা থেকে কিশোরীবাবু হাঁক দিলেন—গোবিন্দ! গেট খুলে দে।

তা হলে পাকুড় থেকে গোবিন্দ ফিরে এসেছে। তার মুখটা দেখলাম বেজায় গম্ভীর। গেটের তালা খুলে দিয়ে সে চাপাস্বরে কর্নেলকে বলল—খামোকা আমাকে কর্তাবাবু হয়রান করলেন। পাকুড়ে যার কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, সে এখানে এসেছে। ব্রজেনবাবু উকিল ওঁকে তা বলেছেন। তবু আমাকে পাঠলেন কর্তাবাবু।

কর্নেল বললেন—গোবিন্দ! এই সুযোগে একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই। মোতিহারিতে তোমার কর্তাবাবুর বাবা মণিমোহনের কাছে তুমি কত বছর আগে গিয়েছিলে?

গোবিন্দ চমকে উঠেছিল। কাঁচুমাচু মুখে সে বলল—তখন আমি বয়সে ছোট। আমার মা এই বাড়ি দেখাশুনা করতেন। কর্তাবাবুও তখন ধানবাদে ছিলেন। বড়বাবুর চিঠি পেয়ে মা আমাকে নিয়ে মোতিহারি গিয়েছিলেন। তখন বড়বাবু মাকে অনেক কথা বলেছিলেন। সময়মতো বলব স্যার।

কিশোরীবাবু বারান্দার গ্রিলের তালা খুলে বেরিয়ে এলেন।—কর্নেলসায়েব! গোবিন্দ আপনার কানে কী ফুসমন্তর দিল?

কর্নেল সহাস্যে বললেন—পাকুড় গিয়ে বেচারা খুব হয়রান হয়েছে। তবে আমরাও প্রায় তাই। সন্ধ্যার দিকে এই এলাকায় রিকশো আসতে চায় না। শীগগির কফির ব্যবস্থা করুন। শীতে জমে গিয়েছি।...

নয়

কিশোরীবাবুর সেই বেডরুমে বসে আমরা কফি পান করছিলাম। সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কিশোরীবাবু রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন।—হ্যাঁ। বলুন ব্রজেনবাবু!...কমলা? কার সঙ্গে?...মহীতোষ—মানে জ্ঞানবাবুর ক্লার্ক?....কী আশ্চর্য!...আপনি কর্নেলসায়েবকে বলেছেন?...ওই ষাট বছর আগের চোথা কাগজ আইনে টিকবে?...চুলোয় যাক ওসব এভিডেন্স! আপনাকে আমি বলেছিলাম, খোকা

বোস এখনও তাক করে আছে। কিন্তু জ্ঞানবাবুর মতো লোককে সে হাত করবে, চিন্তাও করিনি। হ্যাঁ, বলুন!...উইক পয়েন্ট কীসের? ডিসেম্বরে ক্লাবের জেনারেল ইলেকশন। কথা তো হয়েই আছে, ডাক্তার বরাটের জায়গায় মণীন্দ্রবাবু বেঙ্গল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হবেন।...আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি। আপনাকে আমি রাত দশটার মধ্যে জানাব।...ঠিক আছে।

রিসিভার রেখে কিশোরীবাবু কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন—ব্রজেনবাবুকে আমি রিং করে ব্যাপারটা জেনেছি। ওঁকে বলেছিলাম আপনি আইনকানুনের দিক থেকে সবটা খতিয়ে দেখে কিশোরীবাবুকে যেন শীগগির জানাবেন।

কিশোরীবাবু বললেন—জ্ঞানেশ্বর ঘোষ এখানকার নামকরা লইয়ার। বেঙ্গল ক্লাবের সেক্রেটারী। খোকা বোসকে উনি পছন্দ করতেন না। বুঝতে পারছি না, সে ওঁর মতো মানুষকে কীভাবে হাত করল?

—ব্রজেনবাবুকে আমি আপনার উইলের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। ডাক্তার বরাট বেঙ্গল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। বেঙ্গল ক্লাবকে আপনি একটা সম্পত্তি দিয়েছেন। আবার সেই উইলে ডাক্তার বরাটই সাক্ষী। এটা উইলের দুর্বল পয়েন্ট কি না। সাক্ষী উইলের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড পার্টি বলে সাব্যস্ত হতে পারে।

কিশোরীবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—ক্লাবের জেনারেল ইলেকশনের আগে আমি মারা পড়লে ওটা উইক পয়েন্ট বৈকি। তখন কিন্তু আমার আজ রাত তিনটে চল্লিশে অনিবার্য মৃত্যুর চরমপত্র পাইনি।

হালদারমশাই হাসলেন।—আমরা থাকতে আপনারে মারে কেডা?

কর্নেল বললেন—গোবিন্দকে আপনি পাকুড় পাঠিয়েছিলেন কেন?

কিশোরীবাবুকে নিস্তেজ দেখাচ্ছিল। আস্তে বললেন—আপনাকে কথাটা জানানো উচিত ছিল।

—কোন কথাটা?

—আমার বাবার প্রথম বিয়ে সম্পর্কে গুজবের কথাটা। কিন্তু আপনি তখন বলছিলেন, আমরা অনেক সময় জানি না যে আমরা কী জানি! আমি কমলা রায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পাঠিয়েছিলাম।

—কমলা রায় একবার আপনার সৎ দিদি বলে দাবি করতে এসেছিলেন। আপনি কি আপনার বাবার প্রথম বিয়ের কথা আপনার বাবা কিংবা মা, অথবা অন্য কারও কাছে কখনও শোনেননি?

কিশোরীবাবু মুখ নামিয়ে বললেন—আমি সেলফ্-মেড ম্যান। বাবার ছিল বদলির চাকরি। আমি বাবার শাসন সহ্য করতে পারতাম না। এ বাড়িতে থাকত

গোবিন্দের বাবা-মা। আমি এখানে থেকেই স্কুলে পড়েছি। তারপর সাহেবগঞ্জে কলেজে সায়েন্স পড়েছি। মামার বাড়ি সেখানে। মামাই আমার বিয়ে দিয়েছিলেন রমলার সঙ্গে। থাক। আমার জীবনচরিত শোনাতে ইচ্ছে করে না। আপনি এখনও জানতে পারলেন না কে আমাকে উড়ো চিঠি লিখেছে? চরমপত্রই বা কার হাতের লেখা?

—আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি এখনও। আপনার বাবার প্রথম বিয়ে সম্পর্কে গুজবের কথা অবশ্য বললেন। কিন্তু প্রথম কার কাছে তা শুনেছিলেন?

—গোবিন্দের কাছে।

—কবে?

—গত বছর কমলা রায় আমার সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পরদিন সে কথাটা বলেছিল। তার বাবা মোতিহারি থেকে নাকি আমার বাবার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। মা অনেক আগে মারা যান। বাবা মারা যান, আমি তখন ক্লাশ টেনের ছাত্র। গোবিন্দের বাবা রামহরি মুখুয্যে আমাকে বাবার মুখাগ্নি করাতে নিয়ে গিয়েছিল।

—তার মানে রামহরি মুখুয্যে আপনার বাবার একটা উইল পেয়েছিলেন?

—আনরেজিস্টার্ড উইল। রামহরি মুখুয্যেকে খুড়ো বলতাম। সে আমাকে কিছু বলেনি।

—গোবিন্দের এতদিন চুপচাপ থাকা স্বাভাবিক। কমলা রায়ের আবির্ভাবের ফলে সে আপনাকে কথাটা বলা উচিত মনে করেছিল।

কিশোরীবাবু হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন—আমি ওকে চার্জ করলাম, সেই উইল কোথায়? গোবিন্দ বলল, বাবার জিনিসপত্রের মধ্যে খুঁজে দেখবে। ওর সঙ্গে আমিও তন্নতন্ন খুঁজলাম। ওটা পেলাম না। তার ক'দিন পরে ডাকে সেই চোথা কাগজের একটা জেরক্স কপি আমার কাছে এল। আমি ব্রজেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। ব্রজেনবাবু বলল, পাকুড়ের মেয়েটিকে এটা আদালতে প্রোবেট করাতে হবে। সে যদি আমার বাবার কোনও চিঠি, সই বা অন্য কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারে, তা হলে ওটার বৈধতা সাব্যস্ত হবে।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—আর এসব কথা নয়। ব্যাকগ্রাউন্ড যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে।

—কিন্তু কে আমাকে উড়ো চিঠি লিখে হুমকি দিচ্ছে?

—প্রথম পাঁচটা চিঠি হুমকি নয়। আপনাকে সতর্ক করা হয়েছে।

—বুঝলাম না।

—আপনাকে ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট সম্পর্কে সতর্ক করেছে কেউ।

—আপনি বলেছেন অর্ধশিক্ষিত মেয়ের হাতের লেখা।

—ঠিক তাই। সে আপনার হিতৈষীর কাজ করেছে। আপনি বুঝতে পারেননি চিঠির মর্ম। সেটা আপনার দোষ নয়। সবাই সঠিকভাবে মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না।

—চরমপত্র কে লিখেছে জানতে পেরেছেন?

—যে সোমবার রাতে আপনার বাড়িতে ঢুকেছিল এবং গতকাল মঙ্গলবার রাতে এসে আপনার কুকুরকে গুলি করে মেরেছে।

—কে সে? ডাক্তার বরাট?

কর্নেল আস্তে বললেন—দোতলায় সিঁড়ির মুখে তালা দিয়ে এসেছেন। ওই তালার ডুপ্লিকেট চাবি কি কুসুমকুমারীর কাছে আছে?

—না। আগের তালার ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকত। কলকাতা যাওয়ার দিন ওখানে নতুন একটা মজবুত তালা এঁটেছিলাম।

—এটার ডুপ্লিকেট চাবি কুসুমকুমারী চায়নি?

—না। তালাবন্ধ থাকলে ও যখন এ ঘরে কোনও কারণে আসে, তখন ওখানে একটা সুইচ টিপে দেয়। আস্তে ঘন্টা বাজে। শুধু ও নয়, গোবিন্দ বা মোতির মা-ও তাই করে।

—আপনি কোনও কাজে বাইরে গেলে কুসুমের ঘরে বাইরের লোক ঢুকতে পারে। পূর্বদিকে একটা দরজা দেখেছি।

—পারে। কিন্তু গোবিন্দ বা মোতির মার চোখে পড়বে।

—পড়তে না-ও পারে। শিবমন্দিরের পিছনে ঝোপ আছে। এ বাড়ির উত্তরে পাঁচিলের কাছে গাছপালা আছে। এই ঘরের পিছন পর্যন্ত জঙ্গল হয়ে আছে।

—ওটা ফুলের বাগান ছিল। পরিষ্কার করা হয়নি। আপনি কি বলতে চান অন্যের চোখ এড়িয়ে ওইদিক থেকে কেউ কুসুমের ঘরে আসতে পারে?

—পারে। কুসুমকেও আপনি সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন। তা ছাড়া রাত্রে তো কারও পক্ষে আসা সহজ ছিল।

—টনি ছাড়া থাকত।

—সে টনির পরিচিত হলে? আপনি গত দু'রাত্রির ঘটনা ভুলে যাচ্ছেন।

—আমার মাথা কাজ করছে না। তবে আপনার কথা শুনে এটুকু বুঝতে পারছি, আজ রাত্রে কেউ এলে কোনও বাধা পাবে না। টনি নেই। ও মাই গড! তাই কি সে টনিকে সোমবার রাত্রে মারতে এসে সুযোগ পায়নি, গতরাত্রে এসে মেরেছে? আজ বুধবার রাত্রি তিনটে চল্লিশ মিনিটে—

কিশোরীবাবু দু'হাতে মাথার সাদা চুলগুলো আঁকড়ে ধরলেন। হালদারমশাই

চাপাস্বরে বললেন—নতুন তালা আঁটছেন। আপনার বেডরুমে কারেও আসতে দেবেন না। কুসুমকুমারীরেও না।

কর্নেল বললেন—একটা টেলিফোন করব। না—দুটো ফোন দুজনকে।

কিশোরীবাবু শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন—যত ইচ্ছে করুন।

কর্নেল রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন—আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।...আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।...ধন্যবাদ।

দ্বিতীয়বার ডায়াল করে তিনি বললেন—শিবু? আমি কর্নেল সরকার বলছি।....ও! আচ্ছা! শোনো। মিঃ রায়চৌধুরিকে বলবে, আমরা ওঁর কাছে যাচ্ছি।...ধরো, নটার মধ্যে। আর শাকিলমিয়াঁকে বলে রাখো—হ্যাঁ হ্যাঁ। শিবু তুমি বুদ্ধিমান। রাখছি।

কর্নেল রিসিভার রেখে বললেন—গোবিন্দকে ডেকে বলুন, আপনার ড্রাইভার লালুকে চাই। আপনিও আমাদের সঙ্গী হবেন।

কিশোরীবাবু বারান্দায় গিয়ে গোবিন্দকে ডেকে কথাটা জানিয়ে দিলেন। তারপর ঘরে ঢুকে বললেন—বেরুতে হলে তৈরী হওয়া দরকার। বন্দুক আর কয়েকটা কার্টিজ গোবিন্দকে দিয়ে যাব। আমি আমার সিক্সরাউন্ডার রিভলভারটা সঙ্গে নেব।

কর্নেল বললেন—সিঁড়ির দরজায় তালাটা খুলে আমাদের বের করে দিন। আমরা হালদারমশাইয়ের ঘরে অপেক্ষা করছি।...

নিচে নেমে সিঁড়ির ডানদিকে পশ্চিমে গেস্টরুম। বাঁদিকে পূর্বে কুসুমকুমারীর ঘর। দেখলাম, নিচের বারান্দার গ্রিলে তালা আটকানো নেই। গেস্টরুমের তালা খুলে হালদারমশাই আলো জ্বেলে দিলেন। ঘরে একটা খাটে শীতের বিছানা পাতা এবং মশারি-স্ট্যান্ডে মশারি গুটোনো আছে। একটা টেবিল আর গদিআঁটা কয়েকটা চেয়ার আছে। আমরা চেয়ারে বসলাম।

হালদারমশাই সোয়েটারের উপর জ্যাকেট চড়ালেন। মাথায় হনুমানটুপি পরে নিলেন। তারপর তাঁর ব্যাগটা খাটের তলায় ঠেলে দিলেন। তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র প্যান্টের পকেট থেকে বের করে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করে দিলেন।

বিছানায় তাঁর বালিশের তলায় একটা বইয়ের একটু অংশ দেখা যাচ্ছিল।

বললাম—হালদারমশাই সময় কাটাতে বই এনেছেন দেখছি!

গোয়েন্দাপ্রবর কাঁচুমাচু মুখে হেসে বললেন—আমার বই না। কুসুমকুমারীর ঘরে বইখান দেখছিলাম। কবিরাজি চিকিৎসার বই। এ বই আইজকাল পাওয়া যায় না। হেল্পফুল বুক।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে বইটা টেনে নিলেন। পাতা উল্টে বললেন—বেঙ্গল ক্লাবে লাইব্রেরি আছে দেখছি। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। প্রবাসী বাঙালিদের যেমন

কালীপুজোর অভ্যাস মজ্জাগত, তেমনি বাংলা বইয়ের লাইব্রেরি গড়ারও অভ্যাস মজ্জাগত।

বইটার পাতা উল্টে দেখে তিনি হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালেন। হালদার-মশাই বললেন—খুব হেল্পফুল বই না?

—হালদারমশাই! বইটা আমি আজ রাত্রের জন্য নিচ্ছি। কতকগুলো দরকারি ভেষজ ওষুধ নোটবইয়ে টুকে নিয়ে আপনাকে ফেরত দেব। আমি পাহাড়ে জঙ্গলে দুর্গম জায়গায় ঘোরাঘুরি করি। হঠাৎ প্রয়োজনে সঙ্গে ওষুধ না থাকলে জঙ্গলে খুঁজে সেই ওষুধ পাওয়া যাবে।

হালদারমশাই বললেন—আমার আপত্তি নাই। কাইল মহিলারে ফেরত দিমু।....

সিঁড়ির ওপাশে কুসুমকুমারীর ঘরের দরজায় কিশোরীবাবু কিছু বলছিলেন। আমাদের দেখে বললেন—চলুন। লালু এখনই এসে যাবে। কুসুম! বারান্দার গ্রিলে তালাটা এঁটে দাও।

কুসুমকুমারীর কোনও সাড়া এল না।

গেটের কাছে গিয়ে লালুকে দেখতে পেলাম। সে কিশোরীবাবুর কাছে চাবি নিয়ে গ্যারাজ ঘরে ঢুকল। কিশোরীবাবু বন্দুক আর চারটে কার্টিজ গোবিন্দকে দিয়ে বললেন—খামোকা গুলি খরচ করবি না। আর বন্দুক হাতে শীতের মধ্যে ঘুরবি না। যা! ঘরে বন্দুক রেখে এসে বারান্দায় টর্চ নিয়ে বসে থাক। উত্তরদিকটায় লক্ষ্য রাখবি।

গোবিন্দ বন্দুক আর কার্টিজগুলো নিয়ে বলল—আপনি কখন ফিরবেন?

—বলতে পারছি না।

—রান্না চাপিয়েছে যমুনা!

—যখন ফিরব, খেয়ে নেব। ওকে জেগে থাকতে হবে না। তুই জেগে থাকবি। সাবধান!

প্রাইভেট রোড দিয়ে গাড়ি এগিয়ে গঙ্গার ধারে হাইওয়েতে পৌঁছুল। কর্নেল বললেন—লালু! আমরা পুলিশ স্টেশন যাব। শর্টকাটে চলো।

মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা থানার গেটে পৌঁছে গেলাম। কর্নেল বললেন—আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি। লালু! বরং গাড়ি ঘুরিয়ে রাখো।

পিছনের সিটে হালদারমশাই, আমি এবং কিশোরীবাবু ঠাসাঠাসি করে বসেছি। কর্নেলের প্রকাণ্ড শরীরের পাশে আমাদের কারও ঠাঁই হবে না। লালু গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। মিনিট পাঁচেক পরে কর্নেল ফিরে এসে সিটে বসলেন। বললেন—লালু! রায়চৌধুরী সায়েবের বাংলোতে যাব।...

অবিনাশবাবুর বাংলোয় যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় আটটা বাজে। তিনি

ওভারকোট ও টুপি পরে কাঁধে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা একে একে বেরুলে তিনি কিশোরীবাবুর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মেরে বললেন—দোহাই ব্রাদার! আমার গায়ে যেন বোসো না! কর্নেলসায়েব জানেন তো? কিশোরী বলে, ওর পদবি ডাঁশ। গায়ে বসলে পাগল করে ছাড়বে।

কিশোরীবাবু বললেন—অবিনাশদা! তোমার গায়ে শুনেছি গণ্ডারের চামড়া।

—এই দেখ! রাতবিরেতে আমাকে গাল দিতে এসেছে!

হাসি-পরিহাসের মধ্যে আমরা গেস্টরুমে ঢুকলাম। প্রাইভেট ডিটেকটিভ জনান্তিকে আমাকে ফিসফিস করে বললেন—কর্নেলস্যার জিনিয়াস। আইজ রাত্রে মিঃ ডাঁশেরে কেমন সেইফটি দিলেন। কী কন?

কিছুক্ষণ পরে শাকিলমিয়াঁ কফি আর স্ন্যাক্স রেখে গেল। অবিনাশবাবু হাসতে হাসতে বললেন—আজ রাত তিনটে চল্লিশে কিশোরীবাবু মারা পড়ে যাতে আমাকে ফাঁসায়, কর্নেল কি সেই উদ্দেশ্যে ওকে এখানে নিয়ে এলেন?

কিশোরীবাবু বললেন—তোমাকে ফাঁসনোর জন্য অমি এখানে রাত্রিবাস করতে চাই না অবিনাশদা!

কর্নেল বললেন—না কিশোরীবাবু। আপনাকে এখানে রাত কাটানোর জন্য নিয়ে আসিনি!

—তা হলে অবিনাশদাকে শেষবার দেখানোর জন্য আমাকে নিয়ে এসেছেন।

—তা-ও না। আপাতত শুধু এটুকু জানাতে পারি, আমি চেয়েছি আজ রাতে কিছুক্ষণ আপনি বাড়ি ছেড়ে যেন অন্যত্র থাকেন।

অবিনাশবাবু কর্নেলের দিকে তাকালেন। কিশোরীবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন কেন?

—পরে নিজেই জানতে পারবেন। এবার একটা প্রশ্ন করি। বলে কর্নেল কিটব্যাগ থেকে সেই কবিরাজি শাস্ত্রের বইটা বের করলেন।—এই বইটা আপনাদের বেঙ্গল ক্লাবের লাইব্রেরির বই। আপনি কি এটা—

তাঁর কথার উপর কিশোরীবাবু বললেন—আমার আর অ্যালোপ্যাথিতে বিশ্বাস নেই। তাই দু'সপ্তাহ আগে লাইব্রেরিয়ান রতনবাবুর পরামর্শে বইটা নিয়ে এসেছিলাম। তারপর বইটা কুসুম পড়তে নিয়েছিল। আপনি এটা কোথায় পেলেন?

হালদারমশাই বললেন—আমি বইখান কুসুমকুমারীর ঘরে দেখছিলাম। তারে চাইছিলাম। সে আমারে দিছিল।

কর্নেল বইটার মলাট খুলে বললেন—মলাটের সঙ্গে জোড়া দেওয়ার পাতাটা এতে নেই। এই দেখুন। কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। এবার ম্যাজিক দেখুন।

বলে কর্নেল জ্যাকেটের ভিতরে হাত ভরে ভাঁজ করা যে কাগজটা বের করলেন, সেটা সেই 'চরমপত্র'। চিঠিটা নিচের দিকে মলাটের ভিতরে রেখে তিনি বললেন—

হাতের কাছে কাগজ না পেয়ে কেউ এই বইয়ের পাতা ছিঁড়ে চিঠিটা লিখেছিল। গোটা পাতাটাই ছিঁড়ে নিয়েছিল। প্রায় অর্ধেকটা চিঠি লেখার জন্য ব্যবহার করে উপরের অংশটা ঝটপট ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো, বইটার এই ছেঁড়া পাতা আপনি কি লক্ষ্য করেছিলেন?

কিশোরীবাবু মাথা নাড়লেন।—মনে পড়ছে না।

হালদারমশাই বললেন—আমিও লক্ষ্য করি নাই।

কর্নেল বললেন—হাতের লেখাটা কিশোরীবাবু কার তা চিনতে পারেননি। মিঃ রায়চৌধুরিকে চিঠিটা দেখিয়েছিলাম। উনি প্রথমে চিনতে পারেননি। পরে পেরেছেন।

অবিনাশবাবু একটু হেসে বললেন—ভদ্রলোকের ফুলের বাগান করার নেশা আছে। আমার কাছে চিঠি লিখে লাল পপি আর প্যানজি ফুলের বীজ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। একবার স্বয়ং এসে এই সব ফুল দেখে গিয়েছিলেন।

কিশোরীবাবু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন—ডাক্তার বরাট! নিশ্চয় বরাট।

—হ্যাঁ। ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট। তুমিই বলেছ, তোমাকে দেখতে এসে উনি কুসুমের ঘরে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে যান। কুসুমের গান শোনেন।

—কিন্তু আজ রাত তিনটে চল্লিশে কেমন করে সে আমাকে মেরে ফেলবে! তার ওষুধ আর তো আমি খাই না। হঠাৎ অসুস্থ হলেও তো তাকে আর ডাকব না।

কর্নেল বললেন—ধরুন, আজ রাতে কুসুম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে?

—বরাটকে ডাকব না। আরও ডাক্তার আছে চণ্ডীহাটিতে। তাছাড়া আমি ঠিক করেছি, উইল বাতিল করে নতুন উইল করব। কমলাদিকে আমি বঞ্চিত করব না।...

দশ

অবিনাশ রায়চৌধুরি ঘড়ি দেখে বললেন—আপনারা কথা বলুন। আমি এক চক্কর ঘুরে আসি। কিশোরী! তুমি আমার হাতে বন্দী। আজ রাতে ডাক্তার বরাটের চরমপত্রের মতো চরম আহারটাও তুমি এখানে সেরে নেবে। শাকিলমিয়াঁ রাত দশটা নাগাদ মোগলাই ডিনার সার্ভ করবে।

কিশোরীবাবু যেন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। কিছু বললেন না। কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—কুসুম স্বপাক খায়। তাই কি সে নিজে বাজারে যায়?

—নিজে কদাচিৎ যায়। গোবিন্দই তার বাজার করে আনে।

—আজ বিকেলে সে বাজারে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ। আপনি তাকে দেখেছিলেন?

—দেখেছিলাম।

গোয়েন্দাপ্রবর এই সময় বলে উঠলেন—আমি তারে ফলো করছিলাম। বাজার কইর‍্যা সে বারাইল। তখন দেখলাম, একটা লোক তারে কী একটা দিল। ব্যাগের ভিতর রাখল জিনিসটা। সেটা কী তা দেখি নাই।

কিশোরীবাবু বললেন—স্কচ হুইস্কির বোতল। এখানে নেপাল থেকে স্মাগলিং হয়ে আসে। লালুর মাসতুতো দাদা ভারুয়াকে দেখেছেন আপনি। বড়-বড় এলোমেলো চুল। মস্ত গোঁফ, তাগড়াই চেহারা।

হালদারমশাই বললেন—সে-ই বটে।

কর্নেল বললেন—আপনিই কি কুসুমকে স্কচ আনতে বলেছিলেন?

কিশোরীবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—হ্যাঁ। আজ রাতে আমার স্ফূর্তিতে কাটাতে ইচ্ছে হয়েছিল। কুসুমও একটু-আধটু খায়। তবে আমি মন খারাপ থাকলে খাই। যদিও বুঝতে পারি, শরীর আর অ্যালকোহল নিচ্ছে না। কিন্তু এ একটা সাংঘাতিক রাত!

—আপনি কি কুসুমকে বলে এসেছেন ফিরে গিয়ে স্কচ খাবেন?

—হ্যাঁ। বলে এসেছি।

—আপনি কি এখনও কুসুমকে বিশ্বাস করেন?

—করি না। ওর সঙ্গে হুইস্কি খেতে বসলে আমার ফায়ার আর্মস রেডি থাকবে।

—আপনার কি মনে হয় না কুসুম ডাক্তার বরাটের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত আছে?

—থাকতে পারে। কিন্তু কুসুম আমাকে ডাক্তার বরাটের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। তার ওষুধ খেতে সে-ই নিষেধ করেছিল।

—হ্যাঁ। কাল আমাদের সামনেই সে আপনাকে বলছিল, ডাক্তার বরাটের হাতে আপনার প্রাণ। কথাটা আমার অভিনয় বলে মনে হয়নি। এই মহিলার অতীত জীবন যাই হোক, তার ব্যক্তিত্ব আছে।

হালদারমশাই বললেন—ওই মহিলার ঘরে বইয়া ডাক্তার বরাট চরমপত্র লিখছিলেন! মহিলা লেখাপড়া জানে। ডাক্তার কী লিখছেন, সে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করছিল। কর্নেলস্যার কী কন?

কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিলেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে বললেন—ডাক্তার বরাট তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিতেই পারেন। যে কোনও একটা কৈফিয়ত দিতে অসুবিধে কী ছিল?

আমি বললাম—কিন্তু কিশোরীবাবুকে খুন করে ডাক্তার বরাটের কী উদ্দেশ্য

চরিতার্থ হবে? কর্নেল! আপনি কিন্তু সম্ভাব্য খুনের মোটিভের কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। আমার কথা কানে নিলেন না। কিশোরীবাবু ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বললেন—আমাকে মারতে পারলে কুসুমের গার্জেন হবে সে। তারপর তাকে কোনও ছলে প্রতারিত করে দোতলা বাড়িটা হাতাবে। আপনি জানেন না ও ভীষণ অর্থপিশাচ।

—কিন্তু আগাম উড়ো চিঠি দিয়ে আপনাকে খুন করার সময় পর্যন্ত জানিয়ে দেওয়া—এটা আমার স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। একজন ডাক্তার ইচ্ছে করলে তাঁর রোগীকে অন্যভাবে মেরে ফেলতে পারেন। সময় জানিয়ে দিলে তো সে সতর্ক হয়ে উঠবে।

কিশোরীবাবু বললেন—ডাক্তার বরাট তো তখন জানত না আমি কলকাতা থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়ে আসব। সে কী করে জানবে, কর্নেলসায়েবের মতো বিচক্ষণ মানুষও আমার প্রাণ বাঁচাতে ছুটে আসবেন? আর একটা কথা। পুলিশ আমার কেস নেয়নি কেন, তা-ও বুঝতে পারছি। ডাক্তার বরাট নিশ্চয় পলিটিক্যাল লিডার রামলোচন ত্রিবেদীকে ধরে পুলিশকে হাত করেছিল।

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে বললেন—আর ওসব কথাবার্তা নয়। হালদারমশাই, বরং আপনার পুলিশলাইফে এধরনের কোনও কেস ঘটে থাকলে সেই গল্প শোনান। আমি একটা ফোন করে আসি।...

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। বাইরে তাঁর ডাক শোনা গেল—শিবু! শিবু!

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন—প্রায় এইরকম একখান কেস ঘটছিল রানাঘাটে। দলাদলির ব্যাপার। এক পক্ষ বেনামি চিঠি লিখল, অমুক তারিখে রাত্র দুইটায় তোমারে অ্যাটাক করব। অন্য পক্ষ রাত্র একটায় পুলিশ লইয়া রেডি হওনের প্ল্যান করল। কিন্তু প্রথম পক্ষ অ্যাটাক করল রাত্র দশটায়। আমি পুলিশজিপ রেডি রাখছিলাম। তার আগেই মার্ডার!

বললাম—ধরতে পেরেছিলেন কে খুনী?

—ধরছিলাম একডজন মাইনষেরে। প্রমাণের অভাবে ঠিকমতো চার্জশিট দেওয়া যায় নাই।

হালদারমশাই আরও রোমহর্ষক কিছু গল্প শোনালেন। ইতিমধ্যে কর্নেল ফিরে এলেন। তারপর অবিনাশবাবুও ফিরলেন।

রাত দশটায় ডাইনিং রুমে গিয়ে মোগলাই ডিনার খাওয়া হলো। কিশোরীবাবু অল্প কিছু খেলেন। তাঁর মানসিক অবস্থার কথা ভেবে আমরা তাঁকে খেতে পীড়াপীড়ি করিনি।

কিশোরীবাবু বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বক্তব্য : প্রাণের

ভয়ে এভাবে অন্যত্র থাকতে তাঁর খারাপ লাগছে। তাছাড়া আমরা তাঁর সঙ্গে আছি। তাই তাঁর সাহস বেড়ে গেছে। প্রলাপ বকার মতো তিনি বলছিলেন—আমি ডাঁশ। আমি বিষাক্ত নীল মাছি। ডাক্তার বরাটের গায়ে বসব। ওকে পাগল করে ছাড়ব।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ লালু আমাদের কিশোরীবাবুর বাড়ির গেটে পৌঁছে দিল। গোবিন্দ জেগেই ছিল। সে গেট খুলে দিল। আমরা লনে গাড়ি থেকে নামলাম। লালু গ্যারেজে গাড়ি রেখে গোবিন্দকে চাবি দিয়ে চলে গেল। গোবিন্দ গেটে তালা আটকে দিল।

কিশোরীবাবু চাপাস্বরে গোবিন্দকে বললেন—কিছু চোখে পড়েনি তো? সব ঠিকঠাক?

গোবিন্দ বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বন্দুকটা তোর কাছেই রাখ। দরকার হতে পারে। না খেয়ে থাকলে খেয়ে শুয়ে পড়গে।

—আপনাদের দুজনের খাবার আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

—নাঃ। আমরা খেয়ে এসেছি। তুই শুয়ে পড়গে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে খালি বকবক করা ভালো লাগে না।

গোবিন্দের মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম, সে কিছু বলতে চাইছিল। কাঁচুমাচু মুখে সে চলে গেল।

কিশোরীবাবু পা বাড়িয়ে বললেন—আসুন আপনারা।

এই সময় কুসুমকুমারীর ঘর থেকে গুনগুনিয়ে গাওয়া গানের সুর ভেসে এল। কর্নেল একটু হেসে চাপাস্বরে বললেন—আপনার আশায় বসে আছে কুসুম। স্কচ হুইস্কির বোতল সামনে রেখে গান গাইছে। আপনি গিয়ে ওকে সঙ্গ দিন।

কিশোরীবাবু প্রায় নিঃশব্দে নিচের বারান্দার তালা খুললেন। গ্রিলের সংকীর্ণ দরজায় কোনও শব্দ হলো না। আমরা ভিতরে ঢুকলে তিনি তেমনি নিঃশব্দে দরজা টেনে ভিতর থেকে তালা এঁটে দিলেন। তারপর সিঁড়ির দরজার বন্ধ তালাটা খুলে কিশোরীবাবু চাপাস্বরে বললেন—আপনারা গেস্টরুমে গিয়ে বসুন। কুসুম এত রাতে আপনাদের সামনে দোতলায় যেতে লজ্জা পাবে। স্কচের বোতল, গেলাস, সোডাওয়াটার ইত্যাদি দুজনে বয়ে নিয়ে আমার ঘরে যাব। সিঁড়ির দরজা খোলা থাকবে। দোতলায় আমার বেডরুমের পাশের ঘরের দরজাও খোলা থাকবে। ওখানে আপনাদের অসুবিধে হবে না। আমার ওপর হামলার এখনও প্রায় চার ঘণ্টা দেরি আছে।

কথাগুলো বলে তিনি বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলেন। আমি হালদারমশাইয়ের থাকার ঘরের দিকে সবে পা বাড়িয়েছি, দেখলাম কর্নেল কিশোরীবাবুর দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। বারান্দার দু'প্রান্তে চল্লিশওয়াটের দুটো বাল্‌ব জ্বলছে। কিশোরীবাবু

কুসুমের ঘরের দরজায় আস্তে কড়া নাড়লেন। কুসুমের গান থেমে গেল। তার ঘরের দরজাও খুলে গেল। তারপর যা ঘটল, তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

কিশোরীবাবু ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে শুয়ারকা বাচ্চা! কর্নেল! কর্নেল! বাঁচান!

কর্নেল ততক্ষণে দরজায় পৌঁছে গেছেন। হালদারমশাইকে তাঁর অস্ত্র হাতে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলাম।

আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সামলে নিয়ে আমার অস্ত্র বের করে দৌড়ে গেলাম। তারপরই গুলির শব্দ এবং কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ!

দরজায় গিয়ে দেখি, কর্নেল কিশোরীবাবুর একটা হাত চেপে ধরে তাঁর পিঠে হাঁটুর চাপ দিচ্ছেন। কিশোরীবাবুর সেই হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র। কিশোরীবাবু মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন।

ঘরের কোণের দিকে সোফা থেকে উঠে একজন অভিজাত চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক লাল চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে।

দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি, তাঁকে চিনতে দেরি হলো না। ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট। তাঁর হাতে হুইস্কির গেলাস ছিল। এই মাত্র সেটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেছে। কার্পেট ভিজে গেছে।

হালদারমশাই রিভলভার হাতে একবার সেই অচেনা ভদ্রলোকের দিকে একবার ডাক্তার বরাটের দিকে তাক করছেন।—এইটুকখানি নড়লেই খুলি উড়াইয়া দিমু!

কর্নেল বললেন—হালদারমশাই! ওই দরজাটা খুলে দিন।

গোয়েন্দাপ্রবর দরজা খুলতে গেলেন। এবার দেখলাম কুসুমকুমারী সেজেগুজে দরজার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ নিষ্পলক। চাহনি ক্রূর। ফণাতোলা সাপিনীর মতো।

সেই মুহূর্তে ঘটনাটা একটুও বোধগম্য হলো না। ওদিকে হালদারমশাই পূর্বের দরজা খুলে দিতেই পুলিশ অফিসার মিঃ দুবে এবং আরও কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকলেন। কর্নেল বললেন—কিশোরীবাবুর ফায়ার আর্মসটা কেড়ে নিন মিঃ দুবে! এই ভদ্রলোক আমাকে একটু বিপাকে ফেলেছেন।

মিঃ দুবে কিশোরীবাবুর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিলেন। তারপর সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন—বুলেটটা কোথায় বিঁধল?

কর্নেল বললেন—মিঃ রমেন বোসের বুকে গিয়ে লাগার কথা। লেগেছে ছাদে। ওই দেখুন খানিকটা পলেস্তারা উঠে গেছে। এবার এঁকে আপনারা হস্তগত করুন।

দুজন পুলিশ অফিসার এসে আমাকে অবাক করে কিশোরীবাবুর দু'হাত পিছনে টেনে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিলেন। হালদারমশাইও আমার মতো অবাক হয়ে বললেন—এটা কী হইল?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—মিঃ দুবে! এই ডাক্তার ভদ্রলোককে সার্চ করুন। আমার ধারণা, এঁর কাছে একটা ফায়ার আর্মস আছে, যা দিয়ে তিনি চক্রান্ত অনুসারে একটা টেরিয়ার কুকুরকে গুলি করে মেরেছেন। মিঃ হালদার জেগে থাকায় সোমবার রাতে কিশোরীবাবুর গুলি ছোঁড়া এবং এঁর পলায়ন নিছক নাটক।

ডাক্তার বরাট প্রতিবাদ করতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই মিঃ দুবে তাঁর কোটের ভেতর পকেট থেকে খুদে একটা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে নিলেন।

কিশোরীবাবু এতক্ষণে গর্জে উঠলেন—আত্মরক্ষার জন্য আমি ওই শয়তানটার দিকে গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছিলাম। আমাকে গুলি করার জন্য শয়তান খোকা বোস ফায়ার আর্মস তাক করেছিল। ডাক্তার বরাট এর সাক্ষী! কুসুম এর সাক্ষী।

কর্নেল বললেন—কিশোরীবাবু! আপনার স্ত্রী রমলার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আপনি একটা অদ্ভুত রকমের চক্রান্ত করেছিলেন। সেই চক্রান্তে আপনি দুজনের সাহায্য নিয়েছিলেন। একজন ডাক্তার চিত্তরঞ্জন বরাট। অন্যজন কুসুমকুমারী দাসী। রমেনবাবুর সঙ্গে আজ বিকেলে এবং রাত্রে টেলিফোনে কথা বলে আমি জানতে পারি, কুসুম প্রায়ই ওঁকে চিঠি লিখে এখানে আসতে বলত। কুসুম বলত, দুজনের মধ্যে সে আর ডাক্তার বরাট মিলে মিটমাট করে দেবে।

রমেনবাবু বললেন—ডাক্তার বরাটও আমাকে রেগুলার ফোন করত। তবে আমি নিরস্ত্র হয়ে আসিনি। মিঃ দুবে! এই নিন আমার লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস। আমাকে কিশোরী ওভাবে ঘরে ঢুকেই গুলি করবে আমি কল্পনাও করিনি। আমি আসতাম না। কিন্তু আজ কুসুমের এই চিঠিটা পেয়ে ভেবেছিলাম, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার ঘটনা। কিশোরী কেন এতদিন ধরে আমাকে ভুল বুঝে আসছে, তার মীমাংসা করা উচিত।

হালদারমশাই খিক খিক করে হেসে উঠলেন।—এক্কেরে সেই রানাঘাটের কেস। চিঠিতে লিখছিল রাত্র দুইটায় আইয়া অ্যাটাক করব। আইছিল রাত্র দশটায়। মার্ডার কইর‍্যা পলাইয়া গিছল।

কর্নেল বললেন—রাত তিনটে চল্লিশে তোমার মৃত্যু অনিবার্য—এমন একটা কথা কোনও আততায়ী লিখতে পারে। তবে তার উদ্দেশ্য, ভিকটিমকে মিসলিড করা। কিন্তু আমাকে মিসলিড করা কঠিন। কিশোরীবাবু রমেনবাবুকে গুলি করে মেরে আমাকে সাক্ষী রাখতে চেয়েছিলেন। শুধু আমাকে নয়, আমার দুই সঙ্গীকেও সবাই জানে রমেনবাবুর সঙ্গে তাঁর শত্রুতা আছে। অতএব রমেনবাবু তাঁকে দেখে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র বের করতে পারতেন। কিন্তু রমেনবাবুর হাতে অস্ত্র নেই। অথচ কিশোরীবাবু তাঁকে লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দিতে যাচ্ছেন। চরম মুহূর্তে আমি তাঁর হাতটা ধরে ফেলেছিলাম।

রমেনবাবু পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল তাতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে মিঃ দুবের হাতে তুলে দিলেন। মিঃ দুবে বললেন—মিঃ পাণ্ডে! তিন আসামিকে নিয়ে থানায় যান। আমবাগানের ওদিকে প্রিজনভ্যান এতক্ষণ পৌঁছুনোর কথা। শিবমন্দিরের পিছনে খিড়কির দরজা খোলা আছে।

কর্নেল বললেন—আপনাকে বলেছিলাম, যে-ভাবে হোক ওই দিক থেকে চুপিচুপি না ঢুকলে আমাদের সব প্ল্যান ব্যর্থ হবে।

—আমি প্লেন ড্রেসে আছি, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। রাত দশটায় গেটে গিয়ে একটু শব্দ করতেই বন্দুক হাতে গোবিন্দ ছুটে এসেছিল। কিন্তু সে আমাকে চেনে। প্রথমে তো সে ভয়ে কাঁপছিল। তাকে বললাম, তোমার কর্তাবাবুকে বাঁচাতে পুলিশফোর্স এনেছি। আমরা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকব। তুমি শীগগির গিয়ে তালা খুলে দাও। গোবিন্দ বলল, বাবু কর্নেলসায়েবদের সঙ্গে বেরিয়েছেন। এখনও ফেরেননি। এদিকে কী বিপদ দেখুন! ডাক্তার বরাট আর খোকা বোসবাবুকে কখন ওই বাইজি মেয়েটা খিড়কির দরজা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকিয়েছে। মদের আসর বসিয়েছে। বাবু এসে পড়লে কী হবে? দু'জনেই সাংঘাতিক লোক। আমি কিছু বলতে গেলেই আমাকে মেরে গঙ্গার চরে পুঁতে ফেলবে।

কর্নেল হাসলেন।—তার মানে, খিড়কির দরজা খোলাই ছিল?

—গোবিন্দ বলল, কুসুমের কাছে ওই দরজার তালার একটা চাবি আছে। গোবিন্দ অবশ্য সাহস করে আর ওখানে তালা আঁটতে যায়নি। আমি গোবিন্দকে থ্রেটন করলাম। কিশোরীবাবুকে বাঁচানোর জন্য আমরা বাড়িতে ঢুকব। সে যেন এ কথা কিশোরীবাবুকেও না জানায়। কারণ তার কর্তাবাবুর মাথার ঠিক নেই। পুলিশ তাঁকে গার্ড দিচ্ছেন শুনে তিনি হয়তো জোর করে মদের আসরে ঢুকে কেলেংকারি বাধাবেন। গোবিন্দ বুদ্ধিমান। সে বলল, বাবু ওই আসরে ঢুকলেই মারা পড়বেন।

ততক্ষণে হালদারমশাই গেস্টরুম থেকে তাঁর ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। কর্নেল গোবিন্দকে ডেকে কুসুমের ঘরের দরজা বন্ধ করতে বললেন। গোবিন্দ কুসুমের ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখা সরস্বতীমূর্তির পাশ থেকে একগোছা চাবি বের করে বলল—চলুন। বারান্দায় তালা আঁটা আছে। তার একটা চাবি কুসুমের কাছে থাকে।

হালদারমশাই বললেন—তুমি এই মাইয়াটার সব খবর রাখো দেখতাছি!

গোবিন্দ গম্ভীর মুখে বলল—আজ্ঞে, খবর রাখি। ডাক্তার বরাটের সঙ্গে কুসুমের গোপন কথাবার্তা শুনেই তো ভয় হয়েছিল, বাবুকে ওরা মারবে। তাই মেয়েকে দিয়ে বেনামি চিঠি লিখে বাবুকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এটা কী হলো, বুঝতে পারছি না।

কর্নেল বারান্দায় গিয়ে বললেন—তুমি বুদ্ধিমান। বুঝতে চেষ্টা করো এবার।

তোমার বাবুই কুসুম আর ডাক্তারবাবুর সাহায্যে জমিদারবাড়ির এই ভদ্রলোককে খুন করতে চেয়েছিলেন। তোমার বাবুকে তোমারই বেশি করে চেনার কথা। তাঁর মাথায় যা একবার ঢোকে, তা বেরোয় না।

আমরা লনে নামলে তালা এঁটে গোবিন্দ বলল—স্যার! আমার বাবুর আসল রাগ কুসুম মেয়েটাকে নিয়ে। যখন তাকে লুঠে নিতে চেয়েছিলেন, তখন পারেননি। সেই রাগ মনে থেকে গিয়েছিল।

কর্নেল বললেন—হেলেন অব ট্রয়। অনেক রক্তক্ষয়ের পর হেলেনকে যখন উদ্ধার করা হলো, তখন সে বিগতযৌবনা।

মিঃ দুবে হেসে উঠলেন।—ঠিক বলেছেন। হোমার যা লিখে গিয়েছেন, তা সত্য।

রমেনবাবু ক্ষুব্ধভাবে নিজের দুই গালে থাপ্পড় মেরে বলে উঠলেন—ধিক আমাকে। শত ধিক! এখনও আমার মন থেকে পাপ গেল না? আমাকে কিশোরী গুলি করে মারলে নিষ্কৃতি পেতাম।

গেট থেকে বেরুনোর সময় দেখলাম, গোবিন্দের বউ যমুনা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাইভেট রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল হঠাৎ দাঁড়ালেন।—মিঃ বোস! আপনার হাতে একটা জিনিস তুলে দিতে চাই। বলে তিনি কিটব্যাগ থেকে সেই কাঠের বাকসোটা বের করে রমেনবাবুকে দিলেন।

রমেনবাবু অবাক হয়ে বললেন—এতে কী আছে?

—আপনি পাকুড়ের কমলাদেবীর পরিচয় সম্ভবত জানেন।

—হ্যাঁ। জানি। জানি বলেই আমার অ্যাডভোকেট জ্ঞানবাবুকে তার পক্ষে লড়তে বলেছি।

—এই কাঠের বাকসে কিশোরীবাবুর বাবা মণিমোহন ডাঁশের একটা উইল আছে। কমলাদেবীর মায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর তোলা ফোটো আছে। ফোটোটা ফিকে হলেও চেনা যাবে। আরও কিছু কাগজপত্র এতে আছে। এর আইনগত মূল্য কতটা আমি জানি না। তবে কিশোরীবাবু তাঁর উইল বদলে মীমাংসায় রাজী হতে বাধ্য।

মিঃ দুবে হাসলেন।—মীমাংসাটা ডাঁশবাবুকে জেলে বসেই করতে হবে। কিন্তু আপনি এটা কোথায় পেলেন?

—দৈবাৎ কুড়িয়ে পেয়েছি বলতে পারেন। যথাসময়ে সব শুনবেন।

—মিঃ বোস! আপনার গাড়ি কোথায় আছে?

—গঙ্গার ধারে হাইওয়ের কাছে বটতলায় আছে। মন্দির আছে ওখানে।

—আমার অফিসাররা আপনাকে এসকর্ট করে বাড়ি পৌঁছে দেবে। আমি কর্নেল

সায়েবদের মিঃ রায়চৌধুরির বাংলোতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।...

অবিনাশ রায়চৌধুরি যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলাম। লনে গাড়ি থেকে নামতেই তিনি কর্নেলকে বললেন—কী কর্নেলসায়েব! নীল মাছি জালে পড়েছে?

কর্নেল বললেন—আপনার সাহায্য না পেলে আমি নিজেই ফাঁদে পড়ে আটকে থাকতাম।

—ও কিছু না। হ্যালো মিঃ দুবে!

—হ্যালো মিঃ রায়চৌধুরি!

পরস্পর করমর্দন করলেন। কর্নেল বললেন—রাত বারোটায় কফির জন্য শাকিলমিয়াঁকে ওঠানো ঠিক হবে না। আমরা নিজেরাই তৈরি করে নেব।

অবিনাশবাবু বললেন—ওই দেখুন! শাকিলমিয়াঁ আপনাদের ফেরার প্রতীক্ষায় জেগে আছে।

গেস্টরুমে ঢুকে আমরা বসলাম। কর্নেল বললেন—জানেন মিঃ দুবে? মিঃ রায়চৌধুরি আমাকে সচেতন না করলে চক্রান্তটা যে ডাঁশবাবুর, তা টের পেতে দেরি হতো এবং মিঃ বোস তাঁর ফাঁদে পা দিয়ে মারা পড়তেন। তাঁর লাশ গঙ্গার কোন দুর্গম চরে বালির তলায় চাপা পড়ত।

অবিনাশবাবু বললেন—সচেতন কতটা করেছিলাম জানি না। তবে কিশোরীর কাছে শেষ চিঠিটা দেখে আমি ডাক্তার বরাটের হাতের লেখা বলে চিনতে পেরেছিলাম।

—প্রথম পয়েন্টটাই ছিল আমাকে সতর্ক করার পক্ষে যথেষ্ট। ডাঁশবাবু আপনার কাছে এসে এমন একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির খোঁজ চেয়েছিল, যে এজেন্সিকে সরকার বিশ্বাস করেন। তাই না?

—হ্যাঁ। আমি তখনই আপনার নামঠিকানা দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু খটকা লেগেছিল, এমন এজেন্সির সাহায্য কেন সে চায়? এই বিহার মুলুকে কালাশনিকভ রাইফেলধারী বডিগার্ড সুলভ।

কর্নেল হাসলেন।—ঠিক এই পয়েন্ট থেকে আমি ডাঁশবাবুর ব্যাকগ্রাউন্ড এবং উদ্দেশ্য খুঁজতে শুরু করেছিলাম। তারপর বুঝলাম, সে আমাকে বা আমার দলকে সাক্ষী রেখে তার শত্রুকে খতম করতে চায়। আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছোঁড়া অন্তত এই ব্যাকগ্রাউন্ডে—অর্থাৎ বেনামি চরমপত্রের সূত্রে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য না হওয়ার চান্স বেশি।

গোয়েন্দাপ্রবর শ্বাস ছেড়ে বললেন—একেবারে উল্টাপাল্টা কেস। ডাঁশবাবু তাই কইছিল, সে বিষাক্ত নীল মাছি।...

দুর্লভ প্রজাতির অর্কিডের মতো এই বইটাও এতদিন ছিল দুর্লভ। দুষ্প্রাপ্যও বলা যায়। জে ডি হুকারের 'এ সেঞ্চুরি অব ইন্ডিয়ান অর্কিড্স্'। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বোটনিক্যাল সার্ভের উদ্যোগে কলকাতা থেকে 'অ্যানাল্স্ অব দি রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন' নামে প্রকাশিত গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ড ছিল এই বইটি। ক'দিন আগে হঠাৎ বইটির পুনর্মুদ্রণের বিজ্ঞাপন দেখে চৌরঙ্গীর একটা বইয়ের দোকান থেকে কিনে এনেছিলাম।

অক্টোবর মাসে শনিবারের এক সকাল। সবে ছাদের বাগান পরিচর্যা করে এসেছি। তারপর কফি পান করতে করতে বইটার পাতায় চোখ রেখেছি। কিন্তু একটু পরে মনে হলো, আমি বইটা যেন পড়ছি না—কিংবা শুধু মুদ্রিত বর্ণমালাই দেখছি। কী একটা বাধা আমার অবচেতনা থেকে ভেসে উঠছে বারবার। কী যেন ঘটবে। এতক্ষণ ঘটে যাওয়ার কথা ছিল। অথচ ঘটছে না। অথচ কী সেটা, তাও বুঝতে পারছি না।

তরুণ বয়সে সামরিক জীবনে কুড়িয়ে পাওয়া একটা বিস্ময়কর বোধ, যাকে আমি 'ইনট্যুইশন' বলে থাকি, সেই বোধ আমাকে যেন একটা কিছু আকস্মিকতার আভাস দিচ্ছে। এখনও এই বৃদ্ধ বয়সেও বোধটা কখনও কখনও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। একবার তো সরডিহার পাহাড়ি খাতে জঙ্গলের মধ্যে এগোতে গিয়েই বিস্ময়কর এই বোধের আলপিন খোঁচা দিয়েছিল এবং আমি নিজের সচেতন ইচ্ছার বাইরে নিছক যন্ত্রের মতো বাঁদিকে দ্রুত সরে গিয়েছিলাম। পরক্ষণে একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা ঝোপের আড়াল থেকে এসে এক মুহূর্ত আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে নরম মাটিতে আমূল বিঁধে গিয়েছিল।

যৌবনে গেরিলাযুদ্ধের তালিম নেওয়ার পর এই ইনট্যুইশন আরও তীক্ষ্ণ হয়েছিল। তবে এ নিয়ে বড়াই না করাই উচিত। আমি আসলে বলতে চাইছি, সেই সুন্দর সকালে সাইপ্রিপেডিয়াম প্রজাতির অর্কিডের ফুলকে কেন 'লেডি স্লিপার' বা মেমসায়েবদের 'মোকাসিন জুতো' বলা হয়, তার হাস্যকর ব্যাপারটা আমাকে মোটেও আকৃষ্ট করছিল না।

কফি শেষ করে চুরুট ধরালাম। বইটার পাতায় আঙুল রেখে বুজিয়ে দিলাম। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ভাবতে থাকলাম, আমি ঠিক কী ঘটনা ঘটবার আশা করছি? আমার এই জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে আমি অত্যন্ত সুরক্ষিত। কেউ ছোরা বা গুলি ছুঁড়বে, এমন সম্ভাবনাও নেই। কারণ তাহলে তিনতলার জানালার

বাইরে ভেসে থাকার ক্ষমতা তার চাই। ছাদের ড্রেনপাইপগুলো এদিকটায় নেই যে কোনও আততায়ী উঠে আসবে।

আততায়ী! হ্যাঁ—আমার অসংখ্য আততায়ী থাকতেই পারে। তবে এটা চূড়ান্ত সত্য, আমার জীবনে এক চিরকালের অদৃশ্য আততায়ী আছে, যে মাঝে মাঝে অতর্কিতে আমার সামনে একটা রক্তাক্ত লাশ ছুঁড়ে দিয়ে আমাকে চ্যালেঞ্জ করে।

এইসব এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল এবং তখনই মনে হলো, এটাই তাহলে সেই প্রত্যাশিত ঘটনা—কিংবা তার উপক্রমণিকা।

বইটা টেবিলে রেখে রিসিভার তুলে সাড়া দিলাম। এক মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বলছি। আপনি কি মিসেস স্বাগতা দত্তরায়?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি...মাই গুডনেস! মিঃ শেঠ আপনার সম্পর্কে যা বলেছেন, তা এত সত্যি হবে কল্পনাও করিনি।

—মিঃ শেঠ কি বলেছেন, কেউ আমাকে ফোন করলেও আমি তাকে দেখতে পাই? অবশ্য চেনা কণ্ঠস্বর হলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

—কর্নেল সরকার! গত রাতে হোটেল এশিয়ার পার্টিতে আপনার সঙ্গে তত বেশি কথা বলিনি।

—তা ঠিক। তবে প্লিজ অবাক হবেন না, আজ ভোরবেলা থেকে আমি যেন আপনার টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

—তা-ই? সত্যি এ বড় আশ্চর্য ঘটনা কর্নেল সরকার। আমার সন্দেহ হচ্ছে মিঃ শেঠ আপনাকে আজ টেলিফোন করেছিলেন।

—না মিসেস দত্তরায়। নিজের ইনট্যুইশন সম্পর্কে আমার একটু গর্ব আছে। যাই হোক, বলুন।

—আমি আপনার সঙ্গে এখনই দেখা করতে চাই। প্লিজ, যদি আমাকে একটু সময় দেন!

—আমার হাতে প্রচুর সময়। আপনি আসতে পারেন।

—ধন্যবাদ কর্নেল সরকার।...

রিসিভার রেখে চুরুট টানছিলাম। জয়ন্ত আমেরিকা গেছে। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকে তাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কভার করতে পাঠিয়েছে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার অর্থাৎ আমার প্রিয় 'হালদারমশাই'-এর ম্যালেরিয়া। প্রাণভয়ে বিশ্বস্ত নার্সিং হোমে আশ্রয় নিয়েছেন। ম্যালেরিয়া আবার মারমূর্তিতে ফিরে এসেছে। আজ শনিবার। তাই আমার সম্ভ্রান্ত বন্ধুদের আড্ডা দিতে আসবার কারণ নেই। অবশ্য দৈবাৎ কেউ কোনও কারণে এসে পড়তেও পারেন। এলে

তাঁকে বিকেলে আসতে বলব। ব্যস্ততার কৈফিয়ত যথেষ্ট।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল গুস্তাভ ইয়ুংয়ের বইয়ে পড়েছি, তাঁর এক আত্মীয় তাঁকে বলেছিলেন, শয়তান কোনও মানুষকে তার নিষ্ঠুরতম শাস্তিটি দেয়, কী ভাবে জানো? সে তাকে 'এখনই আসছি' বলে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে যায়। কিন্তু আসে না।

হ্যাঁ—প্রতীক্ষার মতো যন্ত্রণাদায়ক আর কিছু নেই। হুকার সায়েবের অর্কিডের বইটা আমাকে প্রতীক্ষার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হলো। জাপানি দেওয়ালঘড়িটা পনের মিনিট অন্তর পিয়ানোর সুর বাজাল। তার কতক্ষণ পরে ডোরবেল বেজেছিল খেয়াল নেই। যথারীতি ডাক দিয়েছিলাম—ষষ্ঠী!

তারপর মিসেস স্বাগতা দত্ত রায় পর্দা তুলে ঘরে ঢুকলেন এবং আমাকে নমস্কার করলেন। বললাম—বসুন। ষষ্ঠী! কফি! আমিও খাব।

স্বাগতার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, আটপৌরে পোশাকেই চলে এসেছেন। রাত্রে ঘুমোতে পারেননি। কলকাতার বনেদি অভিজাত পরিবারের মহিলাদের আমি দেখেছি। স্বাগতা দত্ত রায় তাদেরই একজন। কাল রাত্রে হোটেল এশিয়ায় নাগেশ্বর শেঠের দেওয়া পার্টিতে যাঁকে দেখেছিলাম, এই মহিলা যেন তাঁর প্রতিচ্ছায়া মাত্র। দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল, গৌরবর্ণা, ডায়েটিং এবং যোগব্যায়ামে তনুশ্রী কালিদাসের কাব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া তীক্ষ্ণাগ্র নাক আর টানা চোখ, সব মিলিয়ে কিছুটা রাজপুত সুন্দরীদের আদল আছে। কাল রাত্রে মেমদের মতো চড়া মেক-আপ ছিল মুখে। ববছাঁট চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পরনের শাড়িতেও চাপা উজ্জ্বলতা ছিল। গলায় ছিল মুক্তোর মালা এবং কানে হীরে বসানো সোনার দুল।

এখন সেগুলো নেই। তাছাড়া সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ছে বয়সের ছাপ। গত রাত্রে যাঁকে পূর্ণযৌবনা দেখেছিলাম, এখন তিনি কোনরকমে যৌবনকে শরীরে ধরে রেখেছেন।

স্বাগতার বাঁহাতে গতরাত্রে দেখা সেই ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগটা লক্ষ করছিলাম। সোফার সামনা-সামনি বসে মুখ নামিয়ে উনি আঙুল খুঁটছিলেন। মুখ তুলে বললেন—আপনি কী জেনেছেন, আমি তা জানি না। কে আপনাকে সাংঘাতিক কথাটা জানিয়েছে, তা-ও বুঝতে পারছি না।

তাই আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।

একটু হেসে বললাম—কেউ আপনার কোনও সাংঘাতিক ব্যাপারের কথা আমাকে বলেনি।

স্বাগতার চোখ একটু উজ্জ্বল দেখাল।—তাহলে কেমন করে জানলেন আমি আপনাকে টেলিফোন করব?

—হ্যাঁ। আপনাকে বলছিলাম, ইনট্যুইশন।

—বিশ্বাস করতে পারছি না। কর্নেল সরকার! আমি সত্যিই বিপন্ন। প্লিজ! আমাকে খুলে বলুন, কাল রাত্রে হোটেল এশিয়ার পার্টিতে আপনি কি কোনও আভাস পেয়েছিলেন?

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কিছু স্ন্যাক্স আর দু'পেয়ালা কফি রেখে গেল। বললাম—কাল রাত্রে পার্টিতে আপনি ডিনারের আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা, রাত্রে আপনি কিছু খেতে পারেননি। সম্ভবত সকালেও কিছু খাননি। আমার অনুরোধ, কফি খান। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

—আপনি আগে বলুন, কেন....

স্বাগতার কথার উপর বললাম—হ্যাঁ। আমার ইনট্যুইশনটা সত্যি। বারবার মনে হচ্ছিল, আপনি আমাকে রিং করবেন। কিংবা সোজা এখানে চলে আসবেন।

—কিন্তু কেন?

—আগে কফি প্লিজ! বলছি।

স্বাগতা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আস্তে বললাম—সংক্ষেপে বলছি। আমার সঙ্গে মিঃ শেঠ আপনার আলাপ করিয়ে দিলেন। আপনি তখন স্মার্ট এবং—কী বলব? প্রাণোচ্ছল। মনে হচ্ছিল, আপনি অন্যদের মতো নাচেও যোগ দেবেন। তারপর আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য লক্ষ করিনি। একসময় আপনাকে লেডিজ টয়লেটের করিডর থেকে আসতে দেখলাম। সত্যি বলতে কী, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আপনার চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন দেখছিলাম। আপার মুখে বিপন্নতার স্পষ্ট ছাপ। আপনার ঠোঁট কাঁপছিল। এদিকে-ওদিকে বিভ্রান্তের মতো যেন কাকে খুঁজছিলেন।

—কাকেও খুঁজিনি।

—যাই হোক, আমি আপনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আপনি লিফটের পাশে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে গেলেন। সেই মুহূর্তে আমি ধরেই নিয়েছিলাম, লেডিজ টয়লেটে কোথাও আপনি কোনও ডেডবডি দেখে আতঙ্কে পালিয়ে গেলেন। আমি টয়লেটের দিকে লক্ষ রাখলাম। একে-একে দু'জন মহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁরা হাসিমুখে পরস্পর কথা বলেছিলেন।

স্বাগতা কয়েক চুমুক কফি পানের পর বললেন—শুধু এই দেখেই আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমার কোনও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে?

—দ্যাট্‌স্ রাইট মিসেস দত্তরায়। তবে আর একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়েছিল। আপনি করিডর দিয়ে ব্যস্তভাবে আসবার সময় অন্তত দু'বার আপনার

এই হ্যান্ডব্যাগটা খুলে কিছু খুঁজছিলেন। তাই না?

স্বাগতা আস্তে বললেন—হ্যাঁ।

—অর্থাৎ আপনার এই হ্যান্ডব্যাগে কোনও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল। টয়লেটে সেটা কোনও কারণে গোপনে দেখতে গিয়েছিলেন, সেটা আছে কি না।

স্বাগতা ধরা গলায় বললেন—আমার স্বামী বরুণ বিদেশে যাবার সময় আমাকে চাবিটা রাখতে দিয়েছিল। তার কথামতো আমি এই হ্যান্ডব্যাগে চাবিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম।

—চাবিটা কীসের বলতে আপত্তি আছে?

—আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না। কর্নেল সরকার! আমি আপনার সাহায্যের আশায় ছুটে এসেছি।

—বেশ। বলুন, চাবিটা কীসের?

—আমাদের বেডরুমের দেওয়ালে একটা বাঁধানো ছবি ঝোলানো আছে। আমার সঙ্গে বিয়ের আগে ইতালি থেকে বরুণ ছবিটা কিনে এনেছিল। বিখ্যাত কোন পেইন্টারের ওরিজিনাল ছবি। ছবিটার আড়ালে দেওয়ালে একটা গুপ্ত লকার আছে। বরুণের ঠাকুর্দার তৈরি লকার। সেই লকারের চাবি।

—লকারে কী আছে?

স্বাগতা তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট রঙিন ফোটো আমাকে দিলেন। দেখেই চমকে উঠলাম। রত্নখচিত একটা মূর্তি। মূর্তিটা কোন দেবতার তা বোঝা গেল না। কিন্তু রঙিন ছবি দেখেই বোঝা গেল, হীরা মুক্তো চুনী পান্না ইত্যাদি রত্ন দিয়ে আশ্চর্য শিল্পকৌশলে মূর্তিটা গড়া হয়েছে। ফোটোর পারিপার্শ্বিক বিচারে মূর্তিটা ছোট্ট বলে মনে হলো।

ছবিটা দেখে নিয়ে বললাম—কাল রাত্রে বাড়ি ফিরে লকার খোলা অবস্থায় দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ। ব্যাগে চাবি নেই দেখেই মাথার ঠিক ছিল না। বাড়ি ফিরতে রাত্রি হবে ভেবে ড্রাইভার সাধনকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি নিজে ড্রাইভ করে এলে অ্যাকসিডেন্ট ঘটত।

—আপনার বেডরুম লক করা ছিল?

—ছিল। ল্যাচ-কি সিস্টেমের তালা।

—তালা আঁটা ছিল?

—হ্যাঁ। অথচ কেউ বেডরুমে ঢুকেছিল। লকার খুলে মূর্তিটা চুরি করে পালিয়েছে। আমার ধারণা, লকারের চাবিটা সে কোথাও ছুঁড়ে ফেলেছে। লকারের মুখ খোলা ছিল। ছবিটা দেওয়ালে বেঁকে একটু উঁচু হয়ে ঝুলছিল।

—আপনার বাড়িতে আর কে থাকে?

—বাড়িটা বড়ো। লোকজন কম। বরুণের মাসতুতো ভাই বিপ্লব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বরুণ তাকে এনে নিজের খরচে পড়াচ্ছে। কিন্তু বিপ্লব এ কাজ করেনি। পুজোর ছুটিতে সে কাল দেশে যাবে। সরল আর সাদাসিধে ছেলে। নিজের পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বাড়িতে আমার শ্বশুরের আমলের সারভ্যান্ট অক্ষয় আর তার বউ রাধারানি থাকে। তাদের ছেলেমেয়ে আছে। স্কুলে পড়ে।

চুরুট নিভে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিয়ে বললাম—এখন তো পুজোর ছুটি। আর কে থাকে বাড়িতে?

—রান্না করে সৌদামিনী নামে এক মহিলা। আমরা সদুমাসি বলি। ওর দেশ মেদিনীপুরের কোন গ্রামে। আগে সদুমাসি কখনও-কখনও গ্রামে যেত। কয়েকদিন থেকে আসত। এখন আর যায় না।

—ড্রাইভার?

—হ্যাঁ। সাধন ড্রাইভার থাকে তিলজলায়। ভোর ছটার মধ্যে চলে আসে। বাড়ি ফিরে যায় রাত্রে। কোনও দিন রাত্রি বেশি হলে সে থেকে যায়। গত রাত্রে সে ছিল। নিচের তলায় কয়েকটা ঘর খালি আছে। কাজের লোকেরা সবাই নিচের তলায় থাকে। দোতলার শেষদিকের একটা ঘরে থাকে বিপ্লব।

—তাহলে এখনও পর্যন্ত বাড়ির কেউ কোথাও চলে যায়নি?

—হ্যাঁ। বিপ্লবকে আমি বিশ্বাস করি। বরুণ তো করেই। আমরা বেরুলে বিপ্লবকে লক্ষ রাখতে বলি। আর বিপ্লব যাদবপুর গেলে সদুমাসি লক্ষ রাখে। মহিলা বিশ্বাসী তো বটেই, বিপদে-আপদে ডেয়ারডেভিল প্রকৃতির বলতে পারেন।

—বিপদ-আপদ মানে?

—পাড়ার ছেলেদের চাঁদার জুলুম। তাছাড়া আজকাল তো জানেন, দিনদুপুরে রাস্তায় খনোখুনি, বোমাবাজি এ সব তো আছে। সদুমাসি কিছু গ্রাহ্য করে না। অক্ষয় ভয়ে বেরুতে চায় না। সদুমাসি বেরিয়ে যায়। যখন যা দরকার, কিনে আনে।...

বুঝলাম, আমি কী জানতে চাইছি, তার পরিপ্রেক্ষিত মোটামুটি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন স্বাগতা দত্তরায়। আরও লক্ষ করছিলাম, আমার কথার উত্তর দিতে দিতে ভদ্রমহিলা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি মূর্তিটা শেষবার কবে দেখেছেন?

স্বাগতা আস্তে শ্বাস ফেলে বললেন—আমার বিয়ের পর। প্রায় পনের বছর আগে। সেই প্রথম আর সেই শেষবার দেখেছি। তখন শ্বশুরমশাই বেঁচে ছিলেন। চাবিটা উনি বরুণকে দিয়েছিলেন। বরুণ তখন সবে মিঃ শেঠের ট্রেডিং এজেন্সির

পার্টনার হয়েছে।

—কিন্তু মূর্তির এই ছবিটা তত পুরনো নয়।

—না। বরুণ কখন ছবিটা তুলেছে আমি জানতাম না। ও গত সোমবার নিউইয়র্ক চলে যাওয়ার পর ওর টেবিলের ড্রয়ারে একটা নোটবইয়ের ভেতরে ছবিটা দেখতে পেয়েছিলাম। দেখে অবাক হয়েছিলাম। বরুণ এই ছবিটার কথা আমাকে বলেনি। পরে ভেবেছিলাম, এটা এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়। হয়তো ওর একটা খেয়াল। কিংবা ক্যামেরার ফিল্ম শেষ করার জন্যই ছবিটা তুলেছিল। ওর ছবি তোলার হবি আছে।

—মিঃ দত্তরায়ের টেবিলের ড্রয়ারের চাবি কি আপনার কাছে থাকে?

—না। ওর অফিসের চাবির সঙ্গে থাকে। তবে বাইরে গেলে চাবির গোছা আমাকে দিয়ে যায়।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললাম—দেওয়ালের গোপন লকারের চাবিটা শেষবার কখন দেখেছিলেন?

—মনে পড়ছে না। ওটা এই হ্যান্ডব্যাগের ভেতর একটা খোপে রাখা ছিল। চেন টানলে খোপটা খুলে যায়। ব্যাগটা আমি আলমারির লকারে রাখি। বাইরে গেলে সঙ্গে নিয়ে যাই।

—কাল রাত্রে হোটেল এশিয়ার টয়লেটে গিয়ে কেন হঠাৎ আপনি চাবিটা আছে কি না দেখতে চেয়েছিলেন? বিশেষ কি কোনও কারণ ছিল?

স্বাগতা চুপ করে আছেন। তাঁর নীরবতা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। প্রায় দু'মিনিট পরে আমি চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলাম। দেখলাম, ভদ্রমহিলা নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। বললাম—আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে কি কোনও অসুবিধা আছে?

স্বাগতা আস্তে শ্বাস ফেললেন। তারপর মাথাটা একটু দোলালেন।

—তাহলে বলুন। এই প্রশ্নটার উত্তর আমার কাছে ভাইটাল একটা পয়েন্ট।

স্বাগতা দত্তরায় মুখ নামিয়ে বললেন—বরুণের এক বন্ধু আছে। শৈবাল ব্যানার্জি। সে ফিল্ম ডাইরেক্টর। বরুণ আর আমি দু'জনেই ওকে প্রশ্রয় দিই। বরুণ বাড়িতে না থাকলেও সে আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে যায়। কাল সন্ধ্যায় শৈবাল গিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে তার গতিবিধি অবাধ। পার্টিতে আসবার জন্য আমি বেডরুমের পাশে ড্রেসিং রুমে যখন তৈরি হচ্ছিলাম, শৈবাল তখন বেডরুমে বসে ছিল। যাওয়ার পথে তাকে পার্ক স্ট্রিটে একখানে নামিয়ে দিতে বলেছিল সে। ড্রেসিং রুম থেকে মিনিট দশ-পনের পরে বেরিয়ে দেখি, সে দেওয়ালে ইতালিয়ান ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু বিছানায় আমার এই হ্যান্ডব্যাগটা ছিল। তারপর দু'জনে বেরিয়ে এসেছিলাম। শৈবালকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে হোটেল এশিয়ায় গেলাম। তারপর তো পার্টির হইচইয়ে ডুবে গেলাম। মিঃ শেঠ আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আপনার মনে আছে, মিঃ শেঠ একটু হেসে চাপা স্বরে আমাকে বলছিলেন, 'শুধু প্রকৃতিরহস্যই নয়, অপরাধরহস্যের পিছনেও ছোটাছুটি করা এঁর হবি।'

—হুঁ। মনে পড়ছে।

স্বাগতা একটু উত্তেজিতভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন—আপনি আপনার ইনট্যুইশনের কথা বলেছেন। হয়তো আমারও ইনট্যুইশন আছে। আপনার সঙ্গে আলাপের পরই কেন কে জানে, আমার শৈবালের কথা মনে পড়েছিল। বরুণ আর আমার কাছে শৈবাল প্রায়ই টাকা ধার করে। এ পর্যন্ত এক পয়সাও শোধ দেয়নি। ফিল্মলাইনে আমার এক বন্ধু দীপান্বিতার কাছে শুনেছিলাম, শৈবাল বাজে লোক। ওর অনেক বদনাম আছে। তো আপনার সঙ্গে আলাপের পর কথাগুলো মনে পড়েছিল। আমি পাশের ঘরে থাকার সময় শৈবালের হাতের কাছেই ব্যাগটা রাখা ছিল। তাই—

হাত তুলে বললাম—দ্যাটস এনাফ মিসেস দত্তরায়। ব্যাপারটা এতক্ষণে স্পষ্ট হলো।...

অক্টোবর মাসের সেই শনিবার সকালে মিসেস স্বাগতা দত্তরায় শেষাবধি আমার কাছে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলা যায়। তিনি স্বীকার করেন, ফিল্ম ডাইরেক্টর শৈবাল ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর 'এমোশনাল সম্পর্ক' ছিল। ক্রমশ ইদানীং তা কমে এসেছিল। তাঁর মনে নেই, অথচ সংশয় আছে, কখনও হয়তো কোনও আবেগের মুহূর্তে—বিশেষ করে তাঁর একটু-আধটু ড্রিঙ্কের অভ্যাসও ছিল, এখন নেই, তবে সেই অবস্থায় দৈবাৎ মুখ ফসকে তিনি শৈবালকে গোপন লকারে রাখা মূর্তিটার কথা বলে ফেলতেও পারেন।

গত রাতে হোটেল এশিয়ার পার্টিতে ডিনারে স্বাগতাকে দেখতে না পেয়ে মিঃ শেঠ তাঁকে ফোন করেছিলেন। অনিবার্য কারণে হঠাৎ স্বাগতাকে চলে আসতে হয়েছিল, মিঃ শেঠ সেই কারণটা জানতে চাননি। মহিলাদের অনেক অনিবার্য কারণ থাকতেই পারে। তারপর স্বাগতা আমাকে টেলিফোন করার আগে শৈবালকে ফোন করেছিলেন। শৈবালের ফ্ল্যাটে তার পরিচারক ফোন ধরেছিল। সে বলেছিল, 'স্যার কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় আউটডোর শুটিং আছে।'

এছাড়া এই তথ্যটাও আমার জানবার ছিল। বরুণ দত্তরায় আর নাগেশ্বর শেঠের

কম্পানির পার্টনার নন। নিজে একটা ট্রেডিং কম্পানি খুলেছেন। কম্পানিটা আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত। যন্ত্রাংশ তৈরির একটা ছোট কারখানা আছে তাঁর। সেটা বাহারামগড়ে। সেখানেই তাঁর মাসতুতো ভাই বিপ্লব চৌধুরির বাড়ি। অর্থাৎ তাঁর মাসিমা মৈত্রেয়ী চৌধুরির বাড়ি। বরুণের মেসোমশাই বেঁচে নেই। বিহারের ওই অঞ্চলে একসময় বাঙালিদের আধিপত্য ছিল। বিপ্লবের বাবা শোভন চৌধুরি ছিলেন নামকরা ডাক্তার।

স্বাগতা দত্তরায় আমার আশ্বাস পেয়ে চলে গিয়েছিলেন। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিলাম, একটা সবুজ রঙের মারুতি গাড়ি উনি ড্রাইভ করে এসেছিলেন। অর্কিডের বইটা আর পড়া হলো না। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ব্রেকফাস্টের পর টেলিফোনের রিসিভার তুলে টালিগঞ্জের জয়শ্রী সিনে স্টুডিয়োতে ডায়াল করলাম। একটু পরে সাড়া এলে বললাম—ম্যানেজার মিঃ গোপাল কুণ্ডু আছেন কি?

—বলছি। আপনি কে বলছেন?

—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

অমনই টেলিফোনে ভেসে এল গোপালবাবুর বিদকুটে খ্যা খ্যা হাসি।—কী সর্বনাশ! কর্নেল সায়েব আমাকে মিস্টার বানিয়ে ফেললেন যে! ব্যাপারটা কী?

—দু'একটা কথা আছে গোপালবাবু।

—তাই বলে মিস্টার—খ্যা খ্যা খ্যা! ওঃ কর্নেলসায়েব! আমি ভেবেছিলাম—তো যাকগে আমার ভাবনার কথা। বলুন কর্নেলসায়েব। এ অধম আপনার জন্য কী করতে পারে।

—আপনি কি শৈবাল ব্যানার্জি নামে কোনও ফিল্ম-ডাইরেক্টরকে চেনেন?

—শৈ...শৈ...শৈবাল ব্যানার্জি?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি শৈ শৈ করছেন কেন?

আবার গোপাল কুণ্ডু খ্যা খ্যা করলেন। তারপর বললেন—সে নিশ্চয় আপনার কোনও ক্লায়েন্টকে ফাঁসিয়েছে? কর্নেলসায়েব! আপনার ক্লায়েন্টকে বলে দিন, যা গচ্চা গেছে, তা ফেরত পাওয়ার আশা না করে বরং ওর পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিন। পুলিশ মহলে শৈবালের শক্ত খুঁটি আছে। গুণ্ডামস্তানের ধোলাই খেয়ে যেটুকু শান্তি প্রাণে আসে।

জয়শ্রী সিনে স্টুডিয়োর ম্যানেজার গোপাল কুণ্ডু এ যাবৎ অনেক কেসে আমাকে সাহায্য করেছেন। এই কেসে একটা অন্য বাধার আভাস পাচ্ছি। পুলিশ মহলে শৈবাল ব্যানার্জির শক্ত খুঁটি কে, তা জেনে নিতে হবে।

আমার সাড়া না পেয়ে গোপালবাবু হ্যালো হ্যালো করছিলেন। বললাম—

আমি লাইনেই আছি গোপালবাবু। আমি শুধু জানতে চাইছি, শৈবাল ব্যানার্জি কতগুলো ফিল্ম করেছেন?

—খান দু-তিন হবে। সবই ফ্লপ।

—ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারেন?

—এ পাড়ায় গত কয়েকমাস তাকে দেখিনি। এলে আমার অজানা থাকত না। ওর বাড়ির ঠিকানা চান তো যোগাড় করে দেব। ফোন নাম্বার খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগবে।

—বাড়ির ঠিকানা বা ফোন নাম্বার আমি জানি। ফোন করেছিও।

—কেউ ফোন ধরছে না?

—ওঁর কাজের লোক বলল, স্যার কোথায় শ্যুটিং করতে গেছেন।

—গুল! শেখানো কথা। শৈবাল ব্যানার্জি শ্যুটিং করতে যাবে, আর আমি তা জানব না? এক মিনিট কর্নেলসায়েব!

বলে গোপালবাবু কার সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। একটু পরে তাঁর সাড়া এল।—কর্নেলসায়েব!

—বলুন গোপালবাবু।

—আমাদের ক্যান্টিনবয় মোনা থাকে লিন্টন স্ট্রিটে। শৈবাল ব্যানার্জির ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে। মোনা বলল, ব্যানার্জি সায়েব আর একটি মেয়ে সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বেরিয়ে গেছে। মেয়েটিকে মোনার চেনাচেনা মনে হয়েছিল। কিন্তু চিনতে পারেনি। তবে ওকে এই স্টুডিয়োতেই দেখেছে সম্ভবত।

—আর একটা কথা গোপালবাবু। শৈবাল ব্যানার্জির স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে—

খ্যা খ্যা শব্দ করে আমাকে থামিয়ে গোপাল কুণ্ডু বললেন—সে গুড়ে বালি স্যার। শুনেছি, ব্যানার্জি সায়েব—ওই যে কী বলে—হ্যাঁ, লিভ টুগেদার করেছে। মোনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, লোকটা এবার তার মেয়ের বয়সী কাকেও ফাঁদে ফেলেছে। ওর ফাঁদ মানে তো ফিল্মে নামার সুযোগ এবং—

দ্রুত বললাম—ছাড়ি গোপালবাবু! দৈবাৎ ভদ্রলোকের খবর পেলে আমাকে রিং করবেন।

—তা আর বলতে?

—ধন্যবাদ।...

রিসিভার রেখে দত্তরায় পরিবারের লুকিয়ে রাখা মূর্তির রঙিন ছবিটা এবার আতস কাচ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। মূর্তিটা পুরুষেরই। কিন্তু এটা কোন দেবতার মূর্তি তা বুঝতে পারলাম না। নানা রত্ন জোড়া দিয়ে মূর্তিটা গড়া হয়েছে। শিল্প হিসেবে অসাধারণ তো বটেই। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার, বিভিন্ন রঙের

বিস্ময়কর সামঞ্জস্য। যে এটা গড়েছে, সে কি চিত্রশিল্পী? চিত্রশিল্পী ছাড়া নানা রঙের এমন সামঞ্জস্য এনে মূর্তিটাতে এমন অপার্থিব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা কঠিন। এ ধরনের সূক্ষ্ম কারুকার্য সচরাচর দেখা যায় না।

আমার কাছে বিশ্বের নানা দেশের আইকনোগ্রাফি অর্থাৎ মূর্তিশিল্পসংক্রান্ত একটা প্রকাণ্ড বই আছে। বইটা আলমারি থেকে বের করে আনলাম। তারপর নিজের ধৈর্যের পরীক্ষায় বসলাম। ষষ্ঠী আমাকে আবার এক পেয়ালা কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে একটু উদ্বিগ্ন হলাম। হাজার-হাজার ছবির মধ্যে এই মূর্তির ছবির মিল খুঁজে বের করা কি সম্ভব হবে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, দেওয়ালের যে লকারে মূর্তিটা লুকোনো ছিল তার উপর টাঙানো ছিল একটা ইতালীয় ছবি। বইটার সূচি থেকে ইতালি অধ্যায়ের পাতা দেখে নিলাম। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে আবিষ্কার করলাম, রোমানদের শস্যদেবতা স্যাটার্নের সঙ্গে রঙিন ছবির মূর্তিটার বিস্ময়কর মিল আছে। আমি কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলাম। তাহলে কি এই মূর্তিটা দত্তরায় পরিবারের কেউ ইতালি থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন?

স্বাগতা অবশ্য তাঁর স্বামীর ঠাকুর্দার কথা বলেছিলেন। তিনি কি ইতালি গিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার। বরুণবাবু নাকি তাঁর ব্যবসার কাজে নানা দেশে যান। কিন্তু তাঁর ঠাকুর্দা কেন গিয়েছিলেন? কী ছিল তাঁর পেশা? তিনি বনেদি বড়লোক ছিলেন, তা বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর বড়লোক হওয়ার পিছনে নিশ্চয় কোনও পেশা ছিল। এটা আমার জানা দরকার।

আতস কাচে আবার ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম। এতক্ষণে মনে হলো, মূর্তিটা যে ছোট্ট বেদিতে বসানো ছিল, তার উপরটা কেমন যেন খয়াটে। ঘষে কিছু তুলে ফেলা হয়েছে যেন। ভাস্কর এবং ছবির নাম থাকলে পড়া যেত। রোমান হরফ আমরা চিনি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কেন বেদিটা অমন করে ঘষে হরফগুলো মুছে ফেলা হয়েছে?

বইটা আলমারিতে রেখে এসে ছবিটা টেবিলের ড্রয়ারে একটা খামের মধ্যে রেখে দিলাম। তারপর আর একটা চুরুট টানব কিনা ভাবছি, টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে সাড়া দিলাম।

স্বাগতা দত্তরায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—কর্নেল সরকার বলছেন?

—বলছি। আবার কি কিছু ঘটেছে?

—তেমন কিছু না। একটা কথা জানতে চাইছি। আপনার কি গাড়ি আছে?

একটু অবাক হয়ে বললাম—ছিল। এখন নেই। একটা দু-নম্বরি লাল রঙের ল্যান্ডরোভার ছিল। বেচে দিয়েছি। দু-নম্বরি গাড়ির পাল্লায় পড়লে ফতুর হতে হয়।

—দু-নম্বরি মানে?

—সেকেন্ড হ্যান্ড।

আমার পরিহাসের কোনও সাড়া এল না। না আসবারই কথা। স্বাগতা বললেন—আজ বিকেল চারটের পর কি আপনি ফ্রি আছেন?

—আপনার বক্তব্য জানার পর সেটা ঠিক করব।

—আপনাকে আমাদের বাড়িতে একবার আসতে হবে। ফোনে বলছি না। আপনি কাইন্ডলি যদি বিকেল চারটেতে রেডি থাকেন, আমি গাড়ি পাঠাব। আমার এখন বাড়ির বাইরে থাকা ঠিক হবে না। সাবন একটা সবুজ মারুতি নিয়ে যাবে। গাড়ির নাম্বারটা প্লিজ লিখে রাখুন।

—লেখার দরকার নেই। আপনার সবুজ মারুতির নম্বর আমার মুখস্থ আছে।

—তাই বুঝি? কর্নেল সরকার! আপনার উপর আস্থা আমার বেড়ে গেল। ছাড়ছি। প্রণাম।

—কী সর্বনাশ! প্রণাম কেন?

—আপনি আমার বাবার মতো।...

স্বাগতার কণ্ঠস্বরে আবেগ এসে গিয়েছিল। তারপরই লাইন কেটে গেল। রিসিভার রেখে কিছুক্ষণ ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। জাপানি ওয়ালক্লকে দু'বার পিয়ানোর সুর বাজল। তারপর টং করে একটি নিটোল ধ্বনি। সাড়ে বারোটা বাজল।

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম। সাড়া এলে বললাম—মিঃ শেঠ?

—ইয়া।

দ্রুত বললাম—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।

নাগেশ্বর শেঠ বললেন—আমার মনে হচ্ছে, সামথিং রং ইজ দেয়ার। ইজ ইট কর্নেল সরকার?

—কেন মনে হচ্ছে মিঃ শেঠ? আপনার এমন মনে হওয়ার কি বিশেষ কারণ আছে?

—আছে। কাল রাত্রে হোটেল এশিয়ায় আপনার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলার আলাপ করিয়ে দিলাম। তারপর আমাকে কিছু না বলে কখন উনি চলে গেলেন। ডিনারও খেয়ে গেলেন না। হ্যাঁ—আমি মর্নিংয়ে তাঁকে রিঙ করেছিলাম। উনি বললেন, আই অ্যাম ভেরি সরি। আই হ্যাড টু লিভ দা হোটেল ডিউ টু আনঅ্যাভয়েডেব্‌ল্ সারকামস্ট্যান্সেস এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা।

—আপনার কী ধারণা?

নাগেশ্বর শেঠ ঝানু লোক। তাঁর হাসির শব্দ ভেসে এল।—কর্নেল সরকার!

আই স্মেল আ ডেড র‍্যাট সামহোয়্যার। আপনার প্রকৃত পরিচয় ভদ্রমহিলাকে ইচ্ছে করেই দিয়েছিলাম। আশ্চর্য! আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। ভদ্রমহিলা আপনার কাছ থেকেই পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। এই হলো আমার ধারণা।

অবাক হয়ে বললাম—আমাকে ভয় পাওয়ার কি কোনও কারণ আছে ওঁর?

—আছে। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ট্রেডে বরুণ তার স্ত্রীকে কাজে লাগায়। বরুণ ইজ আ ন্যাস্টি ম্যান। আমার কারবার থেকে তাকে আমি কৌশলে বের করে দিয়েছিলাম। তাকে স্বাধীনভাবে কারবারের সুযোগ করে দিতে হয়েছিল। তার জন্য আমার অনেক টাকা গচ্চা গেছে। বরুণ কোনও কালে শোধ করবে না জেনেও তাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলাম। তবে খুলেই বলছি কর্নেল সরকার। আমি বরুণকে যত ভয় করি তার চেয়ে বেশি ভয় করি তার স্ত্রীকে। তাই ওদের তোয়াজ করে থাকি।

—আমাকে আপনি একটা ভুলভুলাইয়াতে ঢুকিয়ে দিলেন মিঃ শেঠ।

—না, না। আপনি তো জানেন কারবার চালাতে হলে অনেক ক্ষেত্রে মর‍্যালিটিকে পাশ কাটিয়ে চলতে হয়। কিন্তু বরুণের মধ্যে সেন্স অব মর‍্যালিটি বলতে কিছু নেই।

—আপনি তার স্ত্রীর কথা বলুন।

—টেলিফোনে সব কথা বলা যায় না। প্রায় চৌদ্দ-পনের বছর আগে বরুণ জেনেশুনেই ওই সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেছিল। তখন বরুণ আমার পার্টনার। আমার এক বিশ্বস্ত বাঙালি কর্মচারী আমাকে গোপনে জানিয়েছিল, নর্থ ক্যালকাটার এক অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির লোক ছিলেন সত্যব্রত বোস। তাঁর পালিতা কন্যা স্বাগতা। কোন অনাথ আশ্রম থেকে মিঃ বোস তাকে নিয়ে এসেছিলেন। স্বাগতা নাম মিঃ বোসই রেখেছিলেন। এনিওয়ে। কীভাবে স্বাগতা বরুণের প্রেমে পড়ে। বরুণের বাবার সঙ্গে মিঃ বোসের পরিচয় ছিল। তাঁর অমতে স্বাগতা বরুণকে বিয়ে করেছিল। তার কিছুদিন পরে মিঃ বোস বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মিঃ বোসের এক আত্মীয় সন্দেহ করেছিলেন, স্বাগতাই তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। পুলিশ কেস হয়েছিল। তারপর ঘটনাটা ফাইলচাপা পড়ে যায়। কিন্তু এখনও স্বাগতার নাম পুলিশ রেকর্ডে আছে। স্বাগতা আর বরুণ তা জানে।

—ধন্যবাদ মিঃ শেঠ! সম্ভবত এই ব্যাকগ্রাউন্ড জানবার জন্যই আপনাকে রিং করেছিলাম।

—আর একটু জেনে রাখুন। মিঃ বোসের প্রপার্টি স্বাগতার নামে উইল করা ছিল। সেই প্রপার্টি বেচেই বরুণ বিহারে কোথায় একটা ফ্যাকটরি করেছে।

—কিন্তু আপনি স্বাগতাকে ভয় করেন কেন?

—শি ইজ ডেঞ্জারাস। দ্যাটস অ্যানাদার স্টোরি। আমি এক ভুল করেছিলাম। এনিওয়ে, আপনি কাল মর্নিংয়ে আমার বাড়ি আসুন। মুখোমুখি সব বলব।

—ঠিক আছে। আজ আমার স্নানের দিন। রাখছি মিঃ শেঠ।

—জাস্ট আ মিনিট কর্নেল সরকার! আমি বলেছি, আই স্মেল আ ডেড র‍্যাট সামহোয়্যার। প্লিজ, একটু হিন্ট্ অন্তত দিন।

—স্বাগতা দত্তরায় আমার সাহায্য চান।

—ও মাই গড! কী ব্যাপারে?

—ফোনে বলা যাবে না। কাল মর্নিংয়ে আপনার বাড়িতে বসে মুখোমুখি কথা হবে। রাখছি।

রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ালাম। কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম কে জানে, ষষ্ঠী ডাকল—বাবামশাই! আপনার চানের দিন আজ। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ঘুরে পা বাড়িয়ে বললাম—গিজারটা ঠিক আছে তো? না থাকলে তোকে জল গরম করতে হবে।

ষষ্ঠী সন্দিগ্ধভাবে বলল—আপনার কি শরীর খারাপ করছে বাবামশাই?

—না তো!

—আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে।

হাত তুলে বললাম—চাঁটি খাবি বুড়ো বয়সে? এ বুড়োর হাতের মিলিটারি চাঁটি কিন্তু!

ষষ্ঠী আতঙ্কের ভান করে কিচেনে চলে গেল। আমি পোশাক বদলে বাথরুমে ঢুকলাম। সত্যি বলতে কী, এখন আমি একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। বেরুনোর পথ নেই।...

স্বাগতার ড্রাইভার সাধন গাড়ি এনেছিল ঠিক চারটেতে। মধ্যবয়সী বেঁটে গোলগাল চেহারার ড্রাইভারটি কথা বলে কম। ভবানীপুর এলাকায় স্বাগতাদের বাড়ি অবধি পৌঁছনোর মধ্যে অনেক প্রশ্ন করে তার কাছে শুধু জানতে পেরেছিলাম, তার নাম সাধনকুমার মাইতি। অতএব আমার সিদ্ধান্ত ঠিক যে সৌদামিনী তাকে দত্তরায় সায়েবের অফিসে ড্রাইভারের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল (মাইতি পদবি মেদিনীপুরের একচেটিয়া)। হ্যাঁ, গতরাত্রে সে মেমসায়েবের এই গাড়ি থেকে সিনেমার লোক ব্যানার্জিসায়েবকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে নামিয়ে দিয়েছিল। তার শ্বশুরবাড়ি তিলজলায় সে থাকে। ড্রাইভারির কাজ তার আর ভালো লাগে না। কিন্তু এছাড়া আর কীই বা সে করবে? আমাকে পৌঁছে দিয়েই আজ তার ছুটি। কাল রবিবার তার ছুটির দিন।

কলকাতার বনেদি বাড়িগুলো একই ধরনের। গেটের পর লন এবং গাড়িবারান্দা

প্রশস্ত অঙ্গনে ফুলবাগিচা, ঝাউ, পাতাবাহার, টবে ক্যাকটাস এবং বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে কিছু উঁচু গাছ আর একতলা কয়েকটা ঘর। উল্টোদিকে গ্যারাজে সাদা একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি দেখতে পেলাম। গেটে দারোয়ান ছিল না। যে গেট খুলেছিলো, সে অক্ষয়। কারণ গাড়িবারান্দার উপর থেকে স্বাগতা তার নাম ধরে ডেকে কিছু বলেছিলেন।

'দোতলায় একটা সাজানো-গোছানো চওড়া ঘরে আমাকে বসিয়ে অক্ষয় চলে গেল। যাবার সময় ফ্যানের সুইচ টিপে দিয়ে গেল সে। তারপর ভিতরের বাঁদিকের ঘর থেকে স্বাগতা বেরোলেন। করজোড়ে প্রণাম করে তিনি মুখোমুখি বসলেন। তাঁকে সকালের চেয়ে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। আস্তে বললাম—এনি ডেভালাপমেন্ট?

স্বাগতাও মৃদুস্বরে বললেন—দুপুরে সদুমাসির সঙ্গে ঝগড়া করে বিপ্লব তার সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। আমি ওকে আটকাতে পারিনি।

—কী নিয়ে ঝগড়া?

—গতরাত্রে আমি যখন হোটেল এশিয়ায় ছিলুম, তখন বিপ্লব নাকি আমার বেডরুমের তালা খুলছিল। সদুমাসি নিচে রাধারানির সঙ্গে গল্প করছিল। বিপ্লবকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলেছিল, ও ঘরে তার কী দরকার? বিপ্লব বলেছিল, বউদি প্রায়ই তালা দিতে ভুল করে। বরুণ তাকে নাকি তালা চেক করতে বলে গেছে। গতরাতে পার্টি থেকে ফিরে মূর্তিটা নেই দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সদুমাসি তখন কথাটা আমাকে বলেনি। বিপ্লব তাকে নিষেধ করেছিল, বরুণ নাকি তাকে এই দায়িত্ব দিয়ে গেছে। আমি যেন না জানতে পারি। তারপর আজ সকালে যখন আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম, বিপ্লব আমার বেডরুমের তালা খুলেছিল। দুপুরে খাওয়ার পর সদুমাসি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, গতরাত্রি থেকে আমার কী হয়েছে? বলেছিলাম, তেমন কিছু না। শরীর ঠিক নেই। সদুমাসি জানতে চেয়েছিল, আমার ঘর থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা। হারিয়ে থাকলে বিপ্লব তা নিয়েছে। বিপ্লব আড়ি পেতে শুনছিল। ব্যস! তারপর সদুমাসির সঙ্গে ঝগড়া বেধে যায় তার। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা, অক্ষয়ের মেয়ে রিনি বিপ্লবের ঘরের ঠিক নিচে একটা ঝোপে গোপন লকারের চাবি খুঁজে পেয়েছে। এই দেখুন সেই চাবি।...

চাবিটা ছোট্ট। একটা রিঙের মধ্যে আটোঁ হয়ে আছে। স্বাগতাকে জিজ্ঞেস করলাম—এই চাবি কীসের তা কি আপনি কাকেও বলেছেন?

স্বাগতা মাথা দোলাল। তারপর বলল—রিনির সঙ্গে তার ভাই শংকুর চাবিটা নিয়ে কাড়াকাড়ি না বাধলে আমি জানতে পারতাম না। সদুমাসি তখন বাজারে

গিয়েছিল।

—বিপ্লবের ঘরটা আমি দেখতে চাই।

—চলুন।

টানা বারান্দায় পূর্বদিকে এগিয়ে শেষ ঘরটার সামনে দাঁড়াল স্বাগতা। বারান্দার মাঝামাঝি দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। ট্রে হাতে এক শক্তসমর্থ গড়নের প্রৌঢ়াকে সবে উঠতে দেখা গেল। স্বাগতা তাকে বলল—মাসি! কফির ট্রে ড্রয়িংরুমে রেখে বিপ্লবের ঘরটা খুলে দাও।

সৌদামিনী সেই বসার ঘরে ঢুকলে জিজ্ঞেস করলাম—মাসিকে কি আমার পরিচয় দিয়েছেন?

—বলেছি আপনি আমার দূরসম্পর্কের এক জ্যাঠামশাই। কর্নেল সরকার। আপনি এখন থেকে আমাকে নাম ধরে ডাকবেন। তুমি বলবেন। আমি আপনাকে কর্নেলজেঠু বলব।

একটু হেসে বললাম—আপত্তি নেই।

সৌদামিনী এসে আমাকে করজোড়ে প্রণাম করল। তারপর আঁচলের প্রান্তে গিঁটবাঁধা চাবির গোছা থেকে একটা চাবি আলাদা করে নিয়ে তালা খুলল। সে আগেই ভিতরে ঢুকে উত্তর এবং পূর্বের জানালা খুলে দিল। পা বাড়িয়ে হঠাৎ একটা সুগন্ধ টের পেলাম। বিপ্লব কি সেন্ট মাখত?

ঘরে একটা নিচু খাটে বিছানা পাতা আছে। দেওয়ালে ছবি টাঙানো ছিল কয়েকটা। নেই। ফ্রেমের দাগ দেখা যাচ্ছিল। একটা র‍্যাকে বই ছিল। কয়েকটা বই পড়ে আছে বা ঝুলে আছে। জানালার সামনে টেবিলে কয়েকটা ইংরেজি বাংলা রঙিন পত্রিকা। জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল উঁচু বাউন্ডারি পাঁচিলের ধারে দেবদারু গাছের ফাঁকে একটা বাড়ির খোলা জানালা এবং সেখানে এক তরুণীর মুখ—চোখে চোখ পড়তেই সে অদৃশ্য হলো।

স্বাগতা উত্তরের জানালার কাছে গিয়ে বলল—মাসি! তুমি ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখ। বেড়ালটা উৎপাত করতে পারে।

সৌদামিনী তীক্ষ্ণদৃষ্টে আমাকে দেখছিল। গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল। তারপর স্বাগতা চাপা স্বরে বলল,—নিচে ওই যে ঝোপটা দেখছেন, ওই যে লাল ফুল—

—রঙ্গনা ফুলের গাছকে ঝোপ বলছ কেন?

—ওটার তলায় চাবিটা রিনি আর শংকু একই সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল। রিনিই ওটা কুড়িয়ে নিয়েছিল।

—তোমার কী ধারণা?

স্বাগতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার বেডরুমের

ডুপ্লিকেট চাবি বরুণের কাছে আছে। বিপ্লব চাবি পেল কোথায়?

—এমন কি হতে পারে না যে-কোনও কারণেই হোক, বরুণ তার চাবিটা দিয়ে গেছে বিপ্লবকে? বিপ্লব—ধরো, সত্যি কথাই বলছে। তুমি কি তালা দিতে কখনও ভুল করেছ?

স্বাগতা একটু চমকে উঠল যেন।—হ্যাঁ। মানে সে তো মাত্র একবার—খুব তাড়া ছিল, তাই। আর—হ্যাঁ, বাড়িতে থাকলেও নিচে নামার সময় বরুণ বেডরুমে তালা আটকাতে বলত। কোনও-কোনও আমার ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বরুণ আমার অজ্ঞাতসারে বিপ্লবকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে যাবে, এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। তাহলে ধরেই নেব, বরুণ আমাকে বিশ্বাস করে না।

—চলো। কফির তৃষ্ণা পেয়েছে।

বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে স্বাগতা বলল—কিন্তু গোপন লকারের চাবি বিপ্লবই যে হাতিয়েছে, এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। মূর্তিটা সে-ই চুরি করে আমার চোখের সামনে কেটে পড়ল। আমি পুলিশকে জানাতে পারতাম। সদুমাসি আর অক্ষয়কে দিয়ে বিপ্লবকে সার্চ করতে পারতাম। কিন্তু তখনও তো জানি না চাবিটা বিপ্লব ফেলে দিয়ে গেছে। জানার পর ঠিক করলাম, আপনাকে ঘটনাটা বলব। আপনি ঠিক করবেন, এবার বিপ্লবের পিছনে পুলিশকে ছোটানো যায় কিনা। এখনও হয়তো বিপ্লব হাওড়া স্টেশনে আছে।

—তুমি কি কখনও বাহারামগড় গেছ?

—অনেকবার গেছি। বরুণের সঙ্গে গাড়িতে গেছি। ট্রেনে মাত্র একবার।

—শৈবাল ব্যানার্জি তোমাদের সঙ্গে কখনও গেছেন?

স্বাগতা গলার ভিতরে বলল—হ্যাঁ। বারতিনেক গেছে।

—কিছু মনে কোরো না। কোনও বার কি এমন হয়েছে তুমি আর শৈবাল দু'জনে গেছ?

—মনে করার কিছু নেই। আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। হ্যাঁ—মাত্র একবার শৈবালকে একটা শ্যুটিং স্পট দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বরুণ তখন হংকংয়ে ছিল।

কথা বলতে বলতে আমরা দু'জনেই মাঝেমাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। ড্রয়িংরুমের দরজার বাইরে সৌদামিনী দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা ঘরে ঢুকলে সে চলে গেল। সোফায় বসে বললাম—তোমাদের বাড়িতে কুকুর নেই?

—বরুণের বাবার একটা অ্যালশেসিয়ান কুকুর ছিল। কুকুরকে আমার ভীষণ ভয়। তাই কুকুরটা বাঁধা থাকত। সেই কুকুরটা পরে মরে যায়। বরুণ আমার আপত্তিতে কুকুর কেনেনি।

ঘরের ভিতর প্রাক-সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া ঘনিয়ে এলে স্বাগতা উঠে গিয়ে বাতি জ্বেলে দিল। সারিবদ্ধ আলমারিগুলোতে চামড়ায় বাঁধানো বই ঠাসা। বললাম—তোমার শ্বশুরমশাই কি লইয়ার ছিলেন?

—হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন। ওই তাঁর ছবি।

দেখলাম, সামনের দেওয়ালে প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং করা একটা পোর্ট্রেট। চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। চোখে রিমলেস চশমা। ছোট করে ছাঁটা চুল। ডানদিকে সিঁথি। একরাশ গোঁফ।

উঠে দাঁড়িয়ে ছবিটার কাছে গেলাম। খুঁটিয়ে দেখার পর বললাম—পোর্ট্রেটের তলায় অরুণকুমার দত্তরায় লেখা আছে। এম. এ. বি. এল ডিগ্রিও। এ থেকে আমার মনে হয়—

আমি থেমে গেলে স্বাগতা বলল—কী মনে হয়?

—কথাটা অন্যভাবে নিয়ো না। এই পরিবারে অরুণবাবুই প্রথম উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন।

—আমি বুঝে গেছি, মিঃ শেঠ আপনার সম্পর্কে যেটুকু আভাস দিয়েছিলেন, আপনার ক্ষমতা তারও বেশি। বরুণের ঠাকুর্দা প্রতাপবাবু তত বেশি পড়াশুনা করেননি।

—তিনি কি ব্যবসায়ী ছিলেন?

—হ্যাঁ। বরুণের কাছে শুনেছি, উনি অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। একটা ব্যবসা শুরু করতেন। কিছুদিন পরে সেটা বাদ দিয়ে অন্য একটা। অ্যাডভেঞ্চারার টাইপের মানুষ ছিলেন।

বলে স্বাগতা চঞ্চল হয়ে উঠল।—কর্নেলসায়েব! বিপ্লব এখনও হয়তো হাওড়া স্টেশনে আছে। বাহারামগড়ের ট্রেন রাত্রি আটটার আগে নেই। সকাল আটটা আর রাত্রি আটটা।

চুরুট ধরিয়ে বললাম—বিপ্লব মূর্তিটা চুরি করলে হাওড়া স্টেশনে রাত্রি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। অন্য কোনও ট্রেনে চলে যাবে। তারপর সেখান থেকে বাহারামগড় ফিরবে। অবশ্য তার আগেই সে মূর্তিটার ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলে রাখলে তাকেই বেচে দিয়ে যাবে।

স্বাগতা ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। হতাশ ভঙ্গিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে সে বলল—হ্যাঁ। আগে থেকে কারও সঙ্গে সে মূর্তিটার ব্যাপারে কথা বলে থাকতে পারে।

—এমনকি তোমার অজ্ঞাতসারে মূর্তির ছবিটার একটা প্রিন্ট করিয়ে নিতেও পারে। সেই ছবি দেখিয়ে দরাদরি করা সম্ভব।

—কিন্তু বরুণের টেবিলের ড্রয়ারের চাবি সে পাবে কোথায়?

—ধরো, তুমি যখন বাইরে, তখন সে সুযোগ পেয়েছিল। যে আলমারিতে তুমি হ্যান্ডব্যাগ রাখতে, তার চাবি আর ড্রয়ারের চাবির গোছা তুমি কি সঙ্গে নিয়ে বেরোতে?

স্বাগতা দ্রুত বলল—আমার কিছু মনে পড়ছে না। অনেক সময় আমার ভুল হতো, তা আগেই বলেছি।

বাঁদিকের দেওয়ালে আর একটা প্রকাণ্ড পোর্ট্রেট দেখে বললাম—ইনি কে?

—বরুণের ঠাকুর্দা প্রতাপ কুমার দত্তরায়।

এই ছবিটা সাধুসন্ন্যাসীর মতো চেহারার একজন মানুষের। মাথায় কাঁচাপাকা লম্বা চুল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গায়ে গেরুয়া রঙের জামা। বললাম—প্রতাপবাবু কি শেষ জীবনে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হয়েছিলেন?

স্বাগতা কেন যেন একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল—তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর অনেক কীর্তি শুনেছি সদুমাসির কাছে।

—পরে শুনব। চলো! এবার তোমার বেডরুমে যাই।...

ড্রয়িংরুমের বাঁদিকের দরজা দিয়ে বেডরুমের পর্দা খুলে ঢোকামাত্র একটা মউমউ করা সুগন্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্য ঝাঁপিয়ে এসেছিল। তারপর মিলিয়ে গেল। নাকি আমারই মনের ভুল? বিপ্লবের ঘরে তো এই সুগন্ধই ছিল। এমন হতেই পারে, বউদি দেবরকে নিজের পছন্দ একটা পারফিউম উপহার দিয়েছিল। সকালে স্বাগতার মুখে বিপ্লবের প্রশংসা শুনেছিলাম। স্বাগতা কি তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করত?

এবং এই সুগন্ধের সূত্রেই প্রশ্নটা আমার মুখে এসে গেল।—বরুণ যদি তার মাসতুতো ভাইকে এ ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে থাকে, তাহলে তোমরা সেই চাবি তার কাছ থেকে চেয়ে নিলে না কেন?

স্বাগতা রুষ্ট মুখে বলল—সদুমাসি চেয়েছিল। বিপ্লব বলল, বরুণ ফিরে এসে যখন বাহারামগড়ে তার ফ্যাক্টরিতে যাবে, তখন তাকে দেবে। আপনি আসবার একটু আগে আমি নিউইয়র্কে বরুণের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। লাইন পাইনি। হিল্টন হোটেলে তার থাকার কথা। রুম নাম্বার টু থ্রি ও ফোর।

জিরোকে স্বাগতা 'ও' বলায় অবাক হইনি। আমি বেডরুমের পাশে দেওয়ালে ইতালিয়ান ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম। ছবিটা দেখে কিছু বোঝা গেল না। বিমূর্ত চিত্রকলা, রঙবেরঙের আঁকাবাঁকা রেখা। একটু পরে মনে হলো, নারীদেহের প্রতীক ছড়িয়ে রাখা হয়েছে টুকরো টুকরো করে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি ছবির ব্যাপারে সেকেলে দর্শক। ফ্রেমটা ধরে একটু উঁচু করতেই আড়ালের চৌকো লকারটা দেখা গেল। ছ' ইঞ্চি লম্বা, ইঞ্চি চারেক চওড়া ক্রিম রঙের লকার।

দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে আছে। চাবি ঢোকানোর ছিদ্রটা নিচে। আমি ডালাটা খোলার চেষ্টা করছিলাম। স্বাগতা বলল—আবার তালা এঁটে দিয়েছি। এই নিন কুড়িয়ে পাওয়া চাবিটা।

চাবি দিয়ে বাঁদিকে একপাক ঘোরাতেই লকারের মুখ সম্ভবত স্প্রিংয়ের টানে উপরে একটু উঠে গেল। ছবিটা নামিয়ে রেখে প্যান্টের পকেট থেকে খুদে টর্চ বের করে ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখলাম। তলায় একটা পিসবোর্ড আছে। সেটা এমন সেঁটে গেছে যে ওঠানো গেল না। স্বাগতার কাছে একটা ছুরি চাইলাম। সে কোনার দিকে ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরে রাখা লাল রঙের গেলাসের মতো দেখতে একটা কলমাধার থেকে কাগজকাটা ছোট্ট ছুরি দিল। ছুরিটার সাহায্যে পিসবোর্ড তুলে দেখি, একটা জীর্ণ খবরের কাগজের কাটিং রাখা আছে। কাটিংটা সাবধানে বের করলাম। মূর্তিটার ছবি ছাপানো আছে। রোমান হরফে ইতালিয়ান ভাষায় কিছু বাক্যও ছাপানো আছে। বোল্ড টাইপে 'স্যাটার্ন' শব্দটা দেখতে পেলাম। স্বাগতা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল—ওটা কী?

বললাম—ইতালিয়ান ভাষায় মূর্তিটা সম্পর্কে কিছু লেখা আছে। আমি ইতালিয়ান ভাষা জানি না। কিন্তু এটা আমার বোঝা দরকার। আমি কোথাও জেরক্স করে নিয়ে কাগজটা তোমাকে ফেরত দেব।

স্বাগতা সন্দিগ্ধভাবে বলল—এতে কি মূর্তিটা ফিরে পাওয়ার আশা করছেন? মূর্তিটা তো বিপ্লব চুরি করেছে।

বললাম—আমার এই স্বভাব স্বাগতা। ঘটনার গভীরে যেতে চাই। কে বলতে পারে, এই কাগজটার মধ্যে কোনও সূত্র লুকিয়ে নেই?

স্বাগতা শ্বাস ছেড়ে বলল—ঠিক আছে। আমি আমার জীবনটা আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

লকারটা বন্ধ করে ছবিটা আগের মতো টাঙিয়ে চাবি ফেরত দিলাম স্বাগতাকে। তারপর ঘরের ভিতরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে খাটের তলায় উঁকি দিলাম। টর্চের আলোয় তলাটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললাম—এটা কে পরিষ্কার করে?

—অক্ষয়ের বউ রাধারানি। কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন?

—তার আগে বলো, সে যখন ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে, তখন কি তুমি এ ঘরে থাকো?

স্বাগতা একটু ভেবে নিয়ে বলল—সবসময় যে ওকে পাহারা দিই, এমন নয়।

একটু হেসে বললাম—মেয়েটা ফাঁকিবাজ। খাটের তলা সাফ করে না। ধুলো জমে আছে।

—এ ঘরটার ওপাশে গলিরাস্তা। ধুলোময়লা জমে। রাধারানিকে বলা আছে

শুধু মেঝে নয়, রোজ সবকিছু পরিষ্কার করতে হবে। আজ অবশ্য দুপুরে ঘর পরিষ্কার করেছে সে। আমি তখন শুয়েছিলাম।

—খাটের তলায় ধুলো জমে আছে।

স্বাগতা রুষ্টভাবে বলল—মেয়েটাকে বকে দিতে হবে। এখনই ওকে বলছি, ধুলো সাফ করে ফিনাইল দিয়ে খাটের তলা মুছে দিয়ে যাক।

—এখনই নয়। আমি চলে যাওয়ার পরে সাফ করিয়ে নিয়ো। এখন বারান্দার দিকে দরজা খুলে দাও।

ভিতর থেকে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল স্বাগতা। সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে সবখানে। বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল পাতা ছিল। চেয়ারে বসে বললাম—আর মিনিট দশেক থাকব। তুমিও বসো।

স্বাগতা বলল—কফি বলি?

—থাক। বসো। তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

স্বাগতা আমার ডানপাশের চেয়ারে বসল। চুরুটের আগুন নিভে গিয়েছিল। চুরুটটা জ্বেলে নিয়ে বললাম—তোমাদের কোনও সন্তানাদি নেই?

স্বাগতা মুখ নামিয়ে বলল—আপনি আমার বাবার মতো। আমার কোনও সন্তান বাঁচে না। আমার দুর্ভাগ্য। তবে বরুণ মেনে নিয়েছে।

—তোমার বাবার বাড়ি কোথায়?

—বাগবাজারে। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। আমার বাবার নাম সত্যব্রত বোস। নর্থ ক্যালকাটার অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির মেয়ে আমি। বরুণের ফ্যামিলি বড়লোক ছিল। কিন্তু অ্যারিস্টোক্র্যাসি বলতে যা বোঝায়, তা এই ফ্যামিলিতে ছিল না।

—তোমার মায়ের নাম কী?

—নীলাঞ্জনা বোস। আমার মামা প্রিয়নাথ ঘোষ কংগ্রেস এম পি ছিলেন।

বলেই স্বাগতা বিব্রত মুখে প্রশ্ন করল—এসব জেনে আপনি কী করবেন? আমার জীবন ট্র্যাজিক।

আস্তে বললাম—নাগেশ্বর শেঠ, আমার ধারণা, তোমাকে সমীহ করে চলেন। তোমার জন্য উদ্বিগ্ন। কেন?

—মিঃ শেঠ? স্বাগতা চমকে উঠল।—উনি কি আমার সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছেন?

—না বললেও আমার ইম্প্রেসন। ডিনারে তুমি নেই দেখে উনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

স্বাগতা অভ্যাসমতো নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর

একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে বলল—মিঃ শেঠের প্রচুর কালো টাকার খবর আমি রাখি। সেই টাকা উনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেনামে ইনভেস্ট্ করেছিলেন।

—বাই এনি চান্স, শৈবাল ব্যানার্জির সাহায্য পেয়েছিলেন উনি?

—কর্নেলসায়েব! আপনার অবজার্ভেশনের প্রশংসা করি। কিন্তু এসব কথা কেন আসছে জানি না। আমি কী সাংঘাতিক বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইছি, তা নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন। বরুণ মূর্তি চুরির খবর পেলে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে জানি না। খুলেই বলছি, বরুণ প্রয়োজনে ফেরোশাস হয়ে ওঠে। তার লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস্ আছে। আমাকে আর শৈবালকে গুলি করে মারতেও তার হাত কাঁপবে না। স্বাগতা প্রায় কেঁদে ফেলল।—প্লিজ কর্নেলসায়েব! আমি বিপন্ন। আমাকে আপনি বাঁচান।

আবার আস্তে সংযতভাবে বললাম—মিঃ শেঠকে ব্ল্যাকমেল করার মতো তথ্যপ্রমাণ শৈবাল, বরুণ আর তুমি—এই তিনজনের মধ্যে কার হাতে আছে?

—বরুণের হাতে।

—ঠিক আছে। আপাতত ব্যাকগ্রাউন্ডটা জেনে রাখলাম। তুমি চিন্তা কোরো না। বরুণকে কিছু জানিয়ো না। বাই দা বাই, বরুণের কম্পানির কলকাতার অফিস কোথায়?

—ব্র্যাবোর্ন রোডে।

—তার কম্পানির কাজকর্মের দায়িত্ব কার হাতে আছে?

—ম্যানেজার প্রবাল সেনগুপ্ত আছে। তবে আমিই সবকিছু করি।

—কাল থেকে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যাও। আর দরকার হলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ যাতে করতে পারি, তোমার ট্রেডিং এজেন্সির ফোন নাম্বার দাও।

স্বাগতা ঘর থেকে একটা কার্ড এনে দিল। তারপর আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সে সাধনকে খুঁজছিল। সৌদামিনী এগিয়ে এসে বলল—সাধন তো বাড়ি চলে গেছে। তাকে তো বলা হয়নি কিছু।

স্বাগতা রুক্ষ কণ্ঠস্বরে বলল—আমাকে বলে যাবে তো? গাড়ির চাবি কোথায়?

সৌদামিনী বলল—আমাকে দিয়ে গেছে। এই নাও।

বললাম—স্বাগতা! তোমাকে রাত্রিবেলা কষ্ট করতে হবে না। আমি ট্যাক্সি করে চলে যাচ্ছি।

—না, না। আপনার অসুবিধে হবে।

—একটুও না। চলি।

—অক্ষয়কে বলি, ট্যাক্সি ডেকে দেবে। প্লিজ কর্নেলজেঠু। একটু ওয়েট করুন।

—থ্যাংকস। বলে গেট পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছুলাম। স্বাগতা হয়তো অবাক হলো। কিন্তু আমার হাতে এখন কিছু জরুরি কাজ। ব্রড স্ট্রিটে 'ইন্ডো-ইতালিয়ান ফ্রেন্ডস সোসাইটি'তে অভিষেক মিত্রের কাছে পৌঁছতে হবে। অভিষেক ইতালিয়ান ভাষা জানে।...

সে-রাতে অভিষেক পুরনো খবরের কাটিং পড়ে বাংলায় যা লিখে দিয়েছিল, তা এই ঃ

'রোমান শস্যদেবতা স্যাটার্নের প্রাচীন মূর্তি চুরি।

গতরাত্রে ফ্লোরেন্সের প্রখ্যাত প্রত্নদ্রব্য-সংগ্রাহক আলবের্তো চেলিনির সংগ্রহশালা থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নির্মিত রোমান শস্যদেবতা স্যাটার্নের বহুমূল্য রত্নে তৈরি মূর্তিটি চুরি হয়েছে। চেলিনি মহাশয়ের সন্দেহ, জনৈক ভারতীয় সন্ন্যাসী তাঁর অতিথি ছিলেন। তিনিই মূর্তিটি চুরি করে পালিয়েছেন। ইতালি সরকারের প্রত্নবিভাগের সঙ্গে চেলিনি যোগাযোগ করেছেন। মূর্তিটি ইতালির জাতীয় সম্পদ।'...

একেই বলে, চোরের ধনে বাটপাড়ি। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, প্রতাপ দত্তরায় বহুমূল্য রত্নটি বিক্রি করেননি। এমন অবশ্য হতেই পারে, বিক্রি করার ঝুঁকি ছিল বা সুযোগ পাননি। আবার এমনও হতে পারে, অ্যাডভেঞ্চারার প্রতাপবাবুর হাতে নানাসূত্রে প্রচুর টাকা এসেছিল বলে সুন্দর মূর্তিটা বেচতে চাননি। স্বাগতার কাছে জেনেছি, তিনি একটার পর একটা ব্যবসা করতেন। কাজেই টাকা রোজগার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি অবশেষে সাধুসন্ন্যাসীর বেশ ধরেছিলেন কেন এবং কীভাবে ইতালিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন? এসব প্রশ্নের উত্তর পরে জানবার চেষ্টা করা যাবে। সেটা নিছক কৌতূহলের কারণে। আপাতত মূর্তিটা পাচার হয়ে যাওয়ার আগে উদ্ধার করা দরকার।

রাত দশটায় ঠিক করলাম, নাগেশ্বর শেঠের বাড়ি কাল সকালে আমার যাওয়া তত জরুরি নয়। স্বাগতার কথাবার্তা থেকে জেনেছি, বরুণের কাছে মিঃ শেঠের কালো টাকা ফিল্মে লগ্নি করার তথ্যপ্রমাণ আছে। কিন্তু আমার ধারণা, স্বাগতার নিজের কাছেই তা থাকার সম্ভাবনা বেশি। কারণ ফিল্ম ডাইরেক্টর শৈবাল ব্যানার্জির সঙ্গে তার 'এমোশনাল' সম্পর্ক ছিল বা এখনও আছে। অতএব শৈবালের সূত্রে স্বাগতার সেই তথ্যপ্রমাণ হাতানোর সুযোগ ছিল। ওদিকে মিঃ শেঠ বরুণকে টাকা ধার দেওয়ার কথা বলেছেন। বোঝা যাচ্ছে, টাকা ধার দেওয়া নয়, তাঁকে বাধ্য হয়ে টাকা দিতে হয়েছে। বরুণকে নয়, স্বাগতাকেই। বরুণের অনুপস্থিতিতে হোটেল

এশিয়ার পার্টিতে স্বাগতাকে খুশি রাখার জন্যই ডাকতে হয়েছে। ব্যাপারটা স্রেফ ব্ল্যাকমেল!

আমার নিজের আচরণের প্রতি নিজেরই এখন অবাক লাগছিল। মিঃ শেঠের সঙ্গে আমার আলাপের মূলে ছিল ক্যাকটাস। তিনি রাজস্থানের লোক। ট্রেনে যেতে যেতে তাঁর সঙ্গে বছর তিনেক আগে আলাপ হয়েছিল। আমার হাতে ক্যাকটাসের একটা বই ছিল। থর মরুভূমি এলাকার সীমান্তে পাথরের খাড়া পাহাড়ে এক বিরল প্রজাতির ক্যাকটাস জন্মায়। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে ওই ক্যাকটাস সংগ্রহে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। জয়পুরে তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। তিনি একটা জিপগাড়ি এবং মরুচর দু'জন লোক আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। অবশ্য সেই ক্যাকটাস খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু মিঃ শেঠের সঙ্গে বন্ধুতাটা টিকে গিয়েছিল। কলকাতায় ফিরে তাঁর আমন্ত্রণে কতবার কলকাতার নামি হোটেলে তাঁর দেওয়া পার্টিতে গেছি। এইসব ককটেল পার্টি আর ডিনার তাঁর ব্যবসার অঙ্গ। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের কৃতার্থ করে থাকেন। তবে কোন সূত্রে তিনি আমার অন্য পরিচয় খুঁজে বের করেছিলেন, জানি না। হয়তো কোনও পুলিশ অফিসার তাঁকে আমার বিবিধ হবির কথা তাঁকে বলে থাকবেন। তবে মিঃ শেঠ এখনও আমাকে তাঁর কোনও কাজে লাগাননি। এমনও হতে পারে, তাঁর যা কাজ-কারবার, তেমন কোনও বিপদ ঘটলে আমার সাহায্য নেবেন, এমন আশা তাঁর মনে থেকে গেছে। তাই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকতে চান। গত রাত্রে ব্ল্যাকমেলার স্বাগতাকে যে তিনি আমার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য এবার আমার কাছে স্পষ্ট। তিনি স্বাগতাকে যেন ভয় দেখিয়ে বলতে চেয়েছিলেন, সাবধান। এই দেখ আমার একটি বুলডগ আছে।

সাড়ে দশটায় খাওয়ার পর অভ্যাসমতো ড্রয়িংরুমে বসে কফি পান করতে করতে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি বাহারামগড়ে যাব।

কেন্দ্রীয় পর্যটনবিভাগের স্থানীয় অফিসের কর্তা শমীক মজুমদার এতক্ষণ ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরেছে। রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম। মহিলাকণ্ঠে সাড়া এলে বললাম—শমীক যদি থাকে, তাকে বলুন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কথা বলতে চান।

তারপর শমীকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—কর্নেলসায়েব! কী আশ্চর্য! এই অক্টোবরে আপনি কলকাতায় আছেন?

—না শমীক। বিহারের বাহারামগড়ে।

শমীকের হাসি ভেসে এল।—বলুন, বাহারামগড়ে যেতে চাই।

—কেন ডার্লিং? বাহারামগড় থেকে কি টেলিফোন করা যায় না?

—অবশ্যই যায়। কিন্তু চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়! সব কথা বোঝা যায় না।

—অর্থাৎ ট্রাঙ্ককল করতে হয়।

—হ্যাঁ। তো এত দেরি করে বলছেন? আমাকে আজ রাত্তিরটা সময় দিন।

—ট্রেন নাকি সকাল আটটায়?

—ওটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পৌঁছুতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে। আপনি দশটা কুড়িতে কিউল এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে আসানসোল জংশনে নামবেন। তিনঘণ্টার জার্নি। আসানসোল থেকে বাহারামগড় পর্যন্ত লাক্সারি বাস পেয়ে যাবেন। ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে। তো আপনি নিশ্চয় ফরেস্টবাংলো আশা করছেন?

—ওখানে ফরেস্ট আছে নাকি?

—পাঠান জায়গিরদার বাহারাম খাঁর গড় গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কাছাকাছি ফরেস্টবাংলো আছে।

—না। আমি ওখানে বাঙালিটোলার কাছাকাছি কোথাও থাকতে চাই। সরকারি বাংলো নেই?

—আছে। লখিয়া নদীর ধারে একটা পুরনো ডাকবাংলো আছে। নদীর পশ্চিম পারে বাংলো। পূর্ব পারে বাঙালিটোলা। তবে বাঙালিটোলায় আর তত বাঙালি নেই। যাই হোক, আমি দেখছি কী করা যায়। সকাল আটটার মধ্যে আশা করি একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। আমার বেয়ারা কানুহরিকে দিয়ে ওখানকার সচিত্র ট্যুরিজম-লিটারেচার পাঠিয়ে দেব। ম্যাপসহ। তবে সবই আপনার লাক।

—পুজোর সময় ওখানে বাঙালি ট্যুরিস্টদের ভিড় হয় নাকি?

—আগে হতো না। লখিয়া নদীতে ড্যাম হওয়ার পর ওখানে প্রচুর পাখি আসে। আপনি খুশি হবেন। আচ্ছা কর্নেলসায়েব, যদি ইরিগেশন বাংলোতে ব্যবস্থা করে দিই?

—বাঙালিটোলা থেকে কতদূরে?

—একটু দূরে। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার।

—না শমীক! তুমি নদীর ধারে সেই ডাকবাংলোতে চেষ্টা করো। ফার্স্ট প্রেফারেন্স।

—ট্যুরিস্ট লজ নিউ টাউনশিপ এরিয়ায়। যদি সেখানে হয়?

—ঠিক আছে। ওটা সেকেন্ড প্রেফারেন্স। না হলে অগত্যা ড্যামের জলেই ঝাঁপ দিতে হবে।

—ও কে। ও কে বস! ভাববেন না। গুড নাইট।

—গুড নাইট ডার্লিং।...

সামরিক জীবনের অসংখ্য অভ্যাস এই বৃদ্ধবয়সেও আমার মধ্যে থেকে গেছে।

কোথাও যেতে হলে দ্রুত তৈরি হতে পারি। তবে শমীক কোথাও আমার থাকার ব্যবস্থা করতে না পারলেও আমাকে বাহারামগড়ে যেতেই হবে। নিজেই কোনও একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব। এই ভেবে রাত্রেই মোটামুটি ব্যাগেজ তৈরি করে রেখেছিলাম। ভোর ছটায় ছাদের বাগান পরিচর্যার সময় একটুও তাড়াহুড়ো করিনি। আটটায় ড্রয়িংরুমে বসে কফি পানের সময় শমীকের ফোন এসেছিল। পুরনো ডাকবাংলোতেই আমি থাকব। ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার লোক পাঠিয়ে সেই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। আসলে ডাকবাংলোটা পুরনো বলেও নয়, ওখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই বলেই সরকারি অফিসাররা যেতে অনিচ্ছুক। নিউ টাউনশিপে সার্কিট হাউসে এয়ারকন্ডিশন্ড্ ঘর আছে। তাঁরা সেখানে ওঠেন।

আধঘণ্টা পরে শমীকের বেয়ারা এসে আমাকে সচিত্র পর্যটনবৃত্তান্ত দিয়ে গিয়েছিল। একটু আগেই বেরিয়েছিলাম—তখন সওয়া নটা বাজে। তখন অবধি আশা করেছিলাম, স্বাগতা একবার ফোন করে কথা বলবে। তার টেলিফোন আসেনি।

পথে এমন কিছু ঘটেনি, যা জার্নালে লিখে রাখবার যোগ্য। বাহারামগড়ে পৌঁছুলাম সাড়ে চারটে নাগাদ। বাসটার্মিনাস থেকে সাইকেল রিকশোতে চেপে আসবার সময় আমার ডানদিকে পূর্বে উঁচু জমির উপর একটা করে জীর্ণ পাঁচিল ঘেরা বাগানবাড়ি চোখে পড়ছিল। প্রত্যেক বাড়ির গেটের ফলকে বাঙালি বা বাংলা নাম—কোনওটার কোনা ভেঙে গেছে, কোনওটা শ্যাওলায় ঘিরে রেখেছে। কিছু বাড়িতে লোকজন চোখে পড়েছিল। তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বাড়ির তদারককারী অথবা কাজের লোক। শুধু একটা বাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে সালোয়ার-কামিজপরা একটি মেয়ে বেরিয়ে এসেছিল এবং আমাকে অবাক চোখে দেখতে দেখতে উত্তরে বাজার এলাকার দিকে চলে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল মেয়েটি বাঙালি।

দক্ষিণে যাচ্ছিলাম। কখনও ঈষৎ চড়াই, তারপর উৎরাই। ডাইনে পশ্চিমে লখিয়া নদী। নদীতে জলস্রোত শব্দ করছিল। জানি, এসব নদীর তলায় প্রচুর পাথর আছে। এখন শরতে ভরা নদীর দু'ধারে ঝোপঝাড় গাছপালা। তারপর সংকীর্ণ পিচরাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে। রিকশোওয়ালা নেমে ডাইনে ঘুরে এবড়ো-খেবড়ো লাল মাটির রাস্তায় এগোল। ওকে থামতে বলে রিকশো থেকে নামলাম। লোকটা খুশি হয়ে হাসল। এবার পুরনো আমলের পাথরের সাঁকো পেরিয়ে উঁচু জমিতে ডাকবাংলোটা দেখতে পেলুম।

চারদিক ঘিরে ঝোপঝাড়। নিচু পাঁচিল এখানে-ওখানে ভেঙে গেছে। একজন তাগড়াই চেহারার লোক, তার পরনে খাকি প্যান্ট আর গায়ে মেটে রঙের শার্ট,

দৌড়ে এসে সেলাম ঠুকল। বললাম—তুমি বাংলোর চৌকিদার?

—জি হুজুর। মালুম, আপনি কর্নিলসাব আয়েঙ্গা।

—হ্যাঁ।

রিকশোওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। চৌকিদার আমার প্রকাণ্ড ব্যাগটা দু'হাতে তুলে কাঁধে চাপাল। তারপর একপাশে সরে হাত দেখিয়ে বলল—হুজুর কর্নিলসাব! একটু অসুবিস্থা হোবে। চলিয়ে আসুন। কাল রাতমে থোড়াসা বরসাত হলো। মিট্টি ভিজল। হোঁসিয়ারিসে আইয়ে সাব।

—তোমার নাম কী?

—জি, হামি চৌপটলাল আছি।

—তুমি বাংলা বলতে পারো দেখছি।

—জি কর্নিলসাব, থোড়া-থোড়া পারি। ইঁহা বাঙ্গালিটোলা আছে। হামি উনহি বাবুদের কুছু কাম করি। ডাকবাংলো বহৎ পুরানা। ইলেকট্রি না আছে। সেই জন্যতে কোই ভি আসে না। তো হামি আসি। দেখভাল করি।

লোকটা ডাকবাংলোটাকে ভালবাসে, তা বোঝা যাচ্ছিল। এখানে আমার মতো এক সায়েব—অর্থাৎ কর্নিলসাব এসে থাকবে, এতে সে যত খুশি, তত অবাক হয়েছে। তাকে আরও খুশি করার জন্য বললাম—বাঃ! এ তো খুব সুন্দর জায়গা চৌপটলাল।

—জি হুজুর। আপনার কুনো অসুবিস্তা হবে না। কর্নিলসাব! ইয়ে চৌপটলাল কুনো ডর করে না।

বারান্দার সিমেন্ট এখানে-ওখানে চটে আছে। বারান্দায় একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার পেতে রেখেছে চৌপটলাল। সামনে একটা ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ঘরটা পূর্বপ্রান্তে। নদী দেখা যায়। পুরনো একটা খাটে সাদা বিছানা পাতা। মশারি খাটানোর ব্যবস্থা আছে। একটা ইজিচেয়ার আর কাঠের ওয়ার্ডরোব আছে। পূর্বে জানালার সামনে একটা টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে বাইনোকুলার, ক্যামেরা আর পিঠে আঁটা কিটব্যাগটা রেখে বললাম—আমার কাছে কফি, চিনি, টিনের দুধ, বিস্কুট এসব আছে। তুমি আগে আমাকে কফি খাইয়ে দাও।

চৌপটলাল জিভ কেটে বলল—জি কর্নিলসাব। ট্যুরিস্ট লজকি ম্যানিজারসাব আপনার জন্যতে সবকুছ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আপনি ম্যানিজারসাবের গেস্ট্। উনি আপনাকে দেখা করতে ভি আসবেন। আপ কৃপাসে বৈঠিয়ে। উধার পানি অর মগ আছে। হাথমুখ ধুইয়ে নিন।

বেলা পড়ে এসেছে। সে আমার লাগেজ ওয়ার্ডরোবের সামনে রেখে ঝটপট একটা চিনা লণ্ঠন জ্বেলে টেবিলে রাখল। তারপর বেরিয়ে গেল।

আমি বাইনোকুলারটা নিয়ে বারান্দায় গেলুম। সামনে দক্ষিণে তরঙ্গায়িত রুক্ষ প্রান্তর। অদূরে উঁচু ও নিচু পাহাড়ও তরঙ্গায়িত। ওটা ছোটনাগপুর পর্বতমালার রেঞ্জ। বাঁদিকে ঘন জঙ্গল। দক্ষিণের মাঠে নানা গড়নের বড়-ছোট পাথর। কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ঝোপঝাড়। কোথাও নিঃসঙ্গ গাছ। বেলাশেষের রোদের প্রান্ত হালকা নীলাভ কুয়াশায় ঢাকা। তারপর কানে এল পাখিদের কলকাকলি। আশ্চর্য! পাখিদের এই তুমুল চ্যাঁচামেচি কেন যে কানে আসেনি। ভাবলাম, আমি প্রকৃতির খুব কাছে এসে পড়েছি এবং প্রকৃতিও কম রহস্যময় নয়।

বারান্দায় বসে কফি পান করতে করতে নদীর ব্রিজের ওদিকে আলোর ঝলক চোখে পড়ল। একটু পরে মোটরবাইকে চেপে যিনি এলেন, তিনিই ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার। তাঁর নাম রাজেশ শর্মা। সদালাপী ভদ্রলোক তিনি। কলকাতার মজুমদার সায়েবের নির্দেশ পালনে ব্যগ্র। চৌপটলাল তাঁর জন্যও কফি আনল। কথায়-কথায় বাঙালিটোলার ডাক্তার শোভন চৌধুরির প্রশ্ন তুললে রাজেশ শর্মা জানালেন, তিনি বেঁচে নেই। তাঁর স্ত্রী সুরঞ্জনা আর তাঁর মেয়ে শ্রেয়ার সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয় আছে তাঁর। ডাক্তারবাবুর ছেলে বিপ্লবকে দেখেছেন। সে কলকাতায় পড়াশুনা করে।

এই কথার সূত্রে বরুণ দত্তরায়ের কারখানার প্রশ্ন তুলেছিলাম। রাজেশ শর্মা চৌপটলালকে দেখিয়ে বলেছিলেন—চৌপটলালের কাছে সারা এলাকা হাতের তালুর মতো চেনা। এলাকার নাড়িনক্ষত্র সে চেনে। অতএব চৌপটলালের কাছেই জানতে পেরেছিলাম, এক বাঙালি সায়েবের মেসিনপার্টস তৈরির কারখানা আছে বাঙালিটোলার পূর্বে কিছুটা দূরে। ওটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। হ্যাঁ—সেই বাঙালি সায়েবের একটা বাংলো আছে নিউ টাউনশিপে। সেই বাংলোতে চৌপটলালের এক আত্মীয় 'রামপরসাদ' কাজ করে। সে লেখাপড়াজানা লোক। বাংলোর দেখভাল করে। সায়েব-মেমসায়েব এলে চৌপটলাল তা জানতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে রাজেশ শর্মা বললেন—বাহারামগড়ের জঙ্গলে লখিয়া নদীর ধারে একটা আশ্চর্য এবং দেখার মতো জিনিস আছে। আপনি যেন ওটা দেখতে ভুলবেন না।

—কী সেটা?

চৌপটলাল কী বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে রাজেশ শর্মা বললেন—একটা তিনকোনা পাথরের উপর ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতার মতো দেখতে একটা ফুট পাঁচেক উঁচু চ্যাপটা পাথর। এই পাথরটার সঙ্গে নিচের তিনকোনা পাথরটার কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ লম্বা পাতার মতো পাথরটা আশ্চর্যভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লোকে বলে, চণ্ডী-মাইজির জিভ। আগে নাকি নরবলি হতো। কয়েকটা

মড়ার খুলি জিভের নিচে পড়ে আছে। আদিবাসীদের সঙ্গে এই দেবীকে নিয়ে স্থানীয় লোকেদের বিবাদ বেধেছিল শুনেছি। সরকারি অফিসার আর এম এল এ বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এটা অনেক বছর আগের ঘটনা। এখন গ্রীষ্মকালে পূর্ণিমার রাত্রে আদিবাসীরা পুজো করে। আর স্থানীয় হিন্দুরা পুজো করে কার্তিক মাসে অমাবস্যার রাত্রে।

চৌপটলাল বললে—ম্যানিজারসাব! উন্‌হিকো 'জহ্‌রা'-র কথা সমঝে দিন।

শর্মা বললেন—ও হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়। জানেন কর্নেলসাব? চণ্ডীর থানের নিচে একটা ছোট্ট ঢোলের গড়নের জিনিস আছে। সেটা নাকি পুরোটাই মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরি। মানুষের চামড়া ট্যান করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু পোকামাকড়ের মুখ থেকে বেঁচে টিকে থাকবে কী করে? কেউ-কেউ বলেন, প্রি-হিস্টোরিক যুগে এখানকার লোকেরা মমি তৈরি করতে জানত। চামড়াটা কোনও আরকে ভিজিয়ে মমি করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস হয় না।

চৌপটলাল চোখ বড়ো করে বলল—কর্নিলসাব! জো উসিকা উপ্পর হাথ দিবে, তার কুঠ হবে। রঘুয়ার কুঠ হয়েছে। সে এখোন রোজ মাইজির থানে আসে। কান্না করে। হামি দেখেছে।

রাজেশ শর্মা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—উয়ো বাত ছোড়ো। কর্নিলসাবকে লিয়ে ডিনার বানাও।

চৌপটলাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে গেল। কিচেন পিছনের দিকে। আমি বললাম—ওয়াটারডামে বার্ডস স্যাংচুয়ারি আছে শুনেছি। কত দূরে?

—দূর আছে। জিপগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আপনি কি কাল সকালে যেতে চান?

—না। যখন যাব, আপনাকে খবর দেব। বাহারামগড়ের জঙ্গলে কি জন্তু-জানোয়ার আছে?

—হাতির উৎপাত আছে। চিতাবাঘও আছে। মাঝেমাঝে বাঘও আসে। খুব দুর্গম জায়গা। তবে দুর্গের কিছু-কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। যদি যান, আমি একজন বন্দুকবাজকে সঙ্গে দেব। আর একটা কথা। এরিয়াম্যাপটা আনতে ভুলে গেছি। কাল পাঠিয়ে দেব।

—দরকার হবে না মিঃ শর্মা! আপনাদের মজুমদারসায়েব আমাকে এরিয়াম্যাপ দিয়েছে।

—তাহলে ঠিক আছে। চৌপটলাল বিশ্বাসী আর সাহসী লোক। ওকে এলাকার দুর্বৃত্তেরা ভয় পায়। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, যতদিন ইচ্ছা।...

ভোর ছটায় উঠে যথারীতি বাইনোকুলার ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে এবং পিঠে

কিটব্যাগ এঁটে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পিচরাস্তাটা নদীর বাঁকের মুখে পূর্বে চলে গেছে। ডানদিকে সংকীর্ণ লালমাটির রাস্তা দিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম চণ্ডী মাইজির থানের দিকে। প্রায় এক কিলোমিটার নির্জন রাস্তায় হেঁটে নদীর ধারে একটা উঁচু জায়গা চোখে পড়ল। চারদিকে দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড় আর গাছপালায় ঘেরা জায়গাটাই চণ্ডী মাইজির থান, তা ম্যাপ দেখে বুঝলাম। ডাইনে নদীর ধার দিয়ে একটু এগিয়ে ভিতরে ঢোকার পথ।

থানের সামনে লাল পাথুরে মাটি। তারপর সেই প্রাগৈতিহাসিক ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রথমে সত্যিই চমকে গিয়েছিলাম। কালো গ্র্যানাইট কিছুটা তিনকোনা এবং ফুট দুয়েক উঁচু পাথরে কয়েকটা মড়ার খুলির স্তূপ। তার পিছনে ইউক্যালিপ্টাসের পাতার গড়নের ফুট পাঁচেক উঁচু হালকা চ্যাপটা পাথর দাঁড় করানো আছে। মড়ার খুলির নিচে একটা গাঢ় বাদামি রঙের ফুটখানেক লম্বা ঢোলের মতো জিনিস।

আগে বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে এক হাঁটু মুড়ে ঢোলটা আতস কাচের সাহায্যে কিছুক্ষণ দেখে নিলাম। সত্যিই মানুষের চামড়া কিনা, তা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা না করে বলা সম্ভব নয়। এবার চণ্ডীর জিভের পিছনে উঁকি দিলাম। আশ্চর্য বলতেই হয়। জিভের আকৃতি কালো গ্রানাইট শিলার নিচের দিকটাও লম্বা পাতার ডগার মতো বাঁকা। একটা বিন্দুতে যেন নিচের পাথরটাকে ছুঁয়ে আছে জিভ। সামনে মড়ার খুলির স্তূপ দস্তানাপরা হাতে একটু সরিয়ে দেখে নিলাম। এদিকটাও তা-ই। অর্থাৎ ইঞ্চিটাক প্রস্থ জিভ নিচের পাথরকে যেন ছুঁয়ে আছে। এবার পিছিয়ে গিয়ে কয়েকটা অ্যাঙ্গল থেকে ক্যামেরায় চারটে ছবি তুললাম।

শেষ ছবিটা তোলার পর চাপা গরগর শব্দ কানে এল। শব্দটা মোটর গাড়ির। ট্যুরিস্টরা চণ্ডীর থানে আসছে ভেবেছিলাম। কিন্তু থানের পূর্বদিকের কাঁচা রাস্তায় গাড়িটা এগিয়ে চলেছে। আমি নিছক কৌতূহলে থানের পূর্বপ্রান্তে নিবিড় ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, একটা ক্রিমরঙা অ্যামবাসাডার গাড়ি এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় টলতে টলতে অনেক কষ্টে এগিয়ে যাচ্ছে। বাইনোকুলারে—নেহাতই খেয়ালে নাম্বারটা দেখে নিলাম। গাড়িটা ট্যুরিস্টদের বাহারাম খাঁর গড় দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?

আমি এবার খোলা জায়গা দিয়ে নদীর পাড়ে একটা পাথরে বসলাম। একটা শিকারি বাজপাখি ছোঁ দিয়ে নদীর জল থেকে মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। যতক্ষণ না বাজপাখিটা একটা মাছ ধরতে পারবে, ততক্ষণ বসে থাকব। এবং ক্যামেরাতে টেলিলেন্স দ্রুত ফিট করে তাক করে রইলাম। পাখিটার একটা মাছ ধরতে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগল। তার শিকারের ছবি তোলার পর সবে চুরুট

ধরিয়েছি, আবার গাড়ির শব্দ কানে এল। গাড়িটা ফিরে যাচ্ছে। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

বাংলোয় ফিরে যেতে হবে। সামনে অনেক কাজ। সেই রাস্তাটা শিশিরে ভিজে ছিল। রোদে এখন একটু শুকিয়েছে। কয়েক পা চলার পর লাল মাটির উপর আরও গাঢ় লাল রঙের ছোপ পড়েছে। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, গাড়িটার দু'চাকার মাঝামাঝি জায়গায় ছোপগুলো পড়েছে। পিচরাস্তায় পৌঁছে একই ছোপ দেখে থমকে দাঁড়ালাম।

সেই বোধটা—ইনট্যুইশন! আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করার পর ঝোঁকের বশে গাড়িটা যেদিকে গিয়েছিল, সেদিকে হাঁটতে থাকলাম। রাস্তাটা একটু চড়াইয়ে উঠে নেমে গেছে। এখানে দু'ধারে শালের জঙ্গল। লাল ছোপগুলো লক্ষ করে উৎরাইয়ে নেমে দেখি, নদীর উপর একটা কাঠের সংকীর্ণ ব্রিজ। কিন্তু থামগুলো লোহার। বাঁদিকে খানিকটা সমতল ঘাসে ঢাকা জমি। গাড়ির চাকার অনেকগুলো এলোমেলো দাগ। আর ঘাসের উপর প্রচুর জলের চিহ্ন।

ব্রিজ থেকে প্রায় ফুট তিরিশেক দূরে লখিয়া নদী প্রচণ্ড বেগে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জলপ্রপাতের জোরালো শব্দ এখানে। ব্রিজের পশ্চিমে বাহারাম খাঁর গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। আমি সমতল ঘাসের জমিতে দাঁড়িয়ে আছি। রক্তাক্ত কোনও ডেডবডি কেউ বা কারা গাড়ির ডিকিতে বয়ে এনে প্রপাতের মুখে ফেলে দিয়ে গেল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। গাড়িটার ডিকি এখানেই নদীর জল তুলে ধুয়ে ফেলা হয়েছে। ঘাসে জল ছপছপ করছে।

বাইনোকুলারে জলপ্রপাতের নিচের দিকটা দেখার জন্য আবার কাঠের ব্রিজে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আমার ডানদিকে পশ্চিমে কেউ কাশল। ঘুরে দেখি গড়ের দিক থেকে একটা লোক ব্রিজে নেমে এল। তার পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি, কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। তার মাথায় রোদ বাঁচানো ছাইরঙা টুপি। পায়ে সাদা কেডস। এক হাতে একটা বেঁটে লাঠি। কাছাকাছি এসে সে আমাকে সেলাম দিল।

তখন লক্ষ করলাম লোকটা কুষ্ঠরোগী। তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কোথায় থাকো?

সে গোঙানো গলায় জবাব দিল—আমার থাকবার কোনও জায়গা নেই স্যার! যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেখানেই থাকি।

অবাক হয়ে বললাম—তোমার নাম কী?

—স্যার! এ বান্দার নাম আসলাম খাঁ।

—গড়ের জঙ্গলে তুমি রাত কাটিয়েছ নাকি?

—জি স্যার। কেউ বিশ্বাস করে না আমি 'জাগিরদার' বাহারাম খাঁয়ের পাপী বংশধর। গড়ের জঙ্গলে যেতে গাইডরা ট্যুরিস্টদের কাছে বেশি টাকা নেয়। আমি গাইডদের চেয়ে গড়ের জঙ্গল অনেক বেশি চিনি। শুধু হোটেলে একবার খাওয়ার টাকা পেলেই আপনাকে সব দেখিয়ে দেব। হারেম মহলের মেয়েরা ওই প্রপাতের নিচের জলে কোথায় কীভাবে স্নান করতেন, আর তোপখানা কোথায় ছিল, খাজাঞ্চিখানা, দরবার—সব দেখিয়ে দেব। জানোয়ারের ডর নেই স্যার! হাতির পাল এলে কোথায় লুকোতে হবে, আমি সেটাও দেখিয়ে দেব।

লোকটা জায়গিরদার বাহারাম খাঁর বংশধর হোক বা না-ই হোক, তাকে আমার ভালো লাগছিল। আমার মাথার ভিতরে একটা রক্তাক্ত লাশ ভেসে বেড়াচ্ছে এবং আমি বিভ্রান্তও বটে। এই অবস্থায় কথা বলার একজন লোক দরকার ছিল। অবশ্য আমার আটটার মধ্যে বাংলোয় ফেরার কথা। কফির তৃষ্ণা পেয়েছে। চুরুট টানতে ভালো লাগছে না। এদিকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটার মধ্যে কী একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, তাকে এড়ানো যায় না। তার কথা বলার ভঙ্গি, কিংবা তার কষ্ট, তার রাত্রিযাপনের অদ্ভুত কথা—সব মিলিয়ে তাকে এড়িয়ে থাকতে পারলাম না।

বললাম—তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

—বাহারামগড় বাজারে স্যার। কিন্তু আপনি গড়ের ভিতরে চলুন। কাছে এসে কেন ফিরে যাবেন?

—না। পরে যাব। আমার সঙ্গে চলো। তোমার একবেলার খাবারের টাকা আমি দেব।

—তো চলুন মেহেরবান স্যার! আপনি সায়েব। আপনার মতো অনেক সায়েব-মেমসায়েব গড়ের জঙ্গলে আসে। তারা আমেরিকান। স্যার কি আমেরিকান?

হাসবার মতো মনের অবস্থা নয়। তবু হাসতে হলো।—হাসলাম। আমি সায়েব নই। আমি বাঙালি। কলকাতা থেকে এসেছি। আমেরিকান সায়েবদের গায়ের রঙ আমার চেয়ে ফর্সা। তারা কি আমার মতো হিন্দি বলতে পারে?

আসলাম থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল—আমি কলকাতায় গেছি। এখানে বাঙালিটোলা আছে। অনেক বাঙালিসায়েব বাহারামগড়ে বেড়াতে আসেন। কিন্তু আপনার মতো বাঙালি দেখিনি। বাঙালিরা খালি হইহল্লা করে।

পা বাড়িয়ে বললাম—তুমি ঠিক বলেছ। চলো।

লোকটা আমার বাঁদিকে একটু দূরত্ব রেখে পা বাড়াল। হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে

বোঝা যায়। আমিও গতি মন্থর করলাম। সে বলল—আমার কুষ্ঠ হয়েছে বলে ট্যুরিস্টরা আমাকে ঘেন্না করে।

—আমি করছি না। তো আসলাম, কিছুক্ষণ আগে তুমি কি ব্রিজের কাছে মোটরগাড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?

আসলাম আবার দাঁড়াল।—আমি গড়ের জঙ্গলে একটা উঁচু জায়গায় পাথরের গম্বুজের ঘরে বসেছিলাম। ওখান থেকে পুরোটা নজর হয় না। একটা মোটরগাড়ি আসতে দেখেছিলাম। কাঠের ব্রিজে গাড়ি ওঠানো যাবে না। তাই একটু পরে গাড়িটাকে ফিরে যেতে দেখলাম। স্যার! আমি গাড়িটা দেখেই নেমে এসেছিলাম। ট্যুরিস্ট হলে তাদের গড়ের জঙ্গল দেখাব বলে খুব আশা ছিল। কিন্তু গাড়িটা চলে গেল।

—চলো। কথা বলতে বলতে যাই।

—চলুন স্যার! তবে আপনার দেরি হয়ে যাবে। আমি চণ্ডী মাইজির থানে সেলাম করে তবে যাব।

—ঠিক আছে। তো তুমি গাড়ির ট্যুরিস্টদের দেখতে পেয়েছিলে?

—একজনকে গাড়িতে চাপতে দেখেছি।

—আমার চেনা কয়েকজন বাঙালি বাহারামগড়ে এসেছে। আমি তাদের জন্যই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু কেন তারা আমার জন্য অপেক্ষা না করে চলে গেল, বুঝতে পারছি না। তুমি যাকে দেখেছ, তার চেহারা বা পোশাক কেমন ছিল লক্ষ করেছ?

—একটুখানি দেখেছি। গায়ে গলাকাটা নীল গেঞ্জি ছিল—ওই যে আজকাল যা ভদ্রলোকেরা পরে?

—টি-শার্ট! পরনে কী রঙের প্যান্ট ছিল?

—ওই যে আজকাল পরে সবাই—হালকা নীল। পায়ের কাছটা ভাঁজ করা।

—জিনসের প্যান্ট।

—হ্যাঁ স্যার। চোখে কালো চশমা ছিল।

আরও কিছুক্ষণ তার সঙ্গে চলার পর বললাম—রাস্তার ওপর এই ছোপগুলো কিসের বলতে পারো?

আসলাম একটু ঝুঁকে সামনে ও পিছনে গাঢ় লাল ছোপগুলো দেখে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ওদিকে জংলি মানুষদের একটা বসতি আছে। মনে হচ্ছে, তারা বুনো শুওর শিকার করে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে।

—এই ছোপগুলো তা হলে রক্ত?

—হ্যাঁ স্যার। জানোয়ারের রক্ত পড়েছে।

ঘড়ি দেখে আমি বললাম—এই নাও দশটা টাকা। এতে তোমার একবেলা খাওয়া হয়ে যাবে। আমি চলি।

আমি তার কুষ্ঠগ্রস্ত ক্ষতবিক্ষত হাতে টাকাটা গুঁজে দেওয়ায় আসলাম যতটা সম্ভব ঝুঁকে আমাকে সেলাম দিল। তারপর বলল—হুজুর মেহেরবান। আল্লা আপনার মঙ্গল করবেন। হুজুর কোথায় উঠেছেন?

—নদীর ধারে ডাকবাংলোয়। চৌপটলালকে তুমি নিশ্চয় চেনো?

—খুব চিনি হুজুর। তাকে আমার কথা বলবেন।

—বলব। বলে আমি চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। পিচরাস্তায় পৌঁছে দেখলাম, আসলাম আসতে আসতে হঠাৎ থেমে রক্তের ছোপগুলো দেখছে। তার কি কোনও সন্দেহ জেগেছে?

আগেই বলেছি, পিচরাস্তাটা এখানে বাঁক নিয়ে পূর্বে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু পিচরাস্তায় রক্তের চিহ্ন নেই। ব্যাপারটা দেখতে হয়। আমি আবার লালমাটির রাস্তায় কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। তারপর আবিষ্কার করলাম, গাড়িটা বাঁদিকে নিচু ঝোপঝাড় চাকার তলায় দাবিয়ে একটুকরো সমতল ঘাসে ঢাকা জমি থেকে এই মাটির রাস্তায় এসেছিল। চাকার দাগ পরীক্ষা করে বুঝলাম, গাড়িটা এই দিকের জমির উপর দিয়ে ফিরে যায়নি।

ঘাসে ঢাকা জমিতে রক্তের ছাপ রোদে স্পষ্ট হয়ে আছে। পূর্বে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, পিচরাস্তার পাশে কাশঝোপের মধ্যে একটা জায়গায় জলকাদার উপর লাশটা পড়ে ছিল। কিংবা রাখা ছিল। রক্তের দাগ লাল কাদায় সহজে চোখে পড়ে না। কাশঝোপের ওই অংশটা দুমড়ে গেছে। পাশে ফাঁকা জায়গা দিয়ে পিচরাস্তা থেকে গাড়িটা এখানে নেমে এসেছিল। লাশটা ডিকিতে তুলে সোজা পশ্চিমে এগিয়ে লালমাটির রাস্তায় উঠেছে।

কেউ আমাকে লক্ষ করছে কি না বাইনোকুলারে দেখে নিয়ে পিচরাস্তায় উঠলাম। একটুখানি দাঁড়িয়ে জায়গাটা দেখলাম। দৃষ্টি সজাগ না হলে দোমড়ানো কাশঝোপ চোখে পড়বে না। রোদ তীব্র হলে ফাঁকা ঘাসজমিতে শিশিরের সঙ্গে মেশা রক্ত শুকিয়ে যাবে। অবশ্য শিশির রক্তের ছোপ ফিকে করে ফেলেছে, তাও ঠিক। কাজেই ব্যাপারটা কারও চোখে পড়ার চান্স খুবই কম। তবু জায়গাটার কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম।

ডাকবাংলোয় ফেরার পর একটা সিদ্ধান্তে এলাম। যাকেই খুন করা হোক, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে করা হয়নি তা হলে অনেক বেশি রক্ত দেখতে পেতাম। সম্ভবত আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে খুনটা করা হয়েছে। রক্ত ক্রমাগত চুঁইয়ে পড়ার কারণ গুলি হার্টে বিঁধেছিল। রক্ত বন্ধ হতে দেরি হয়েছে। রক্তের ছোপ দেখে আমার

ধারণা, ভোরের দিকে খুনটা হয়েছে। গাড়িটা এসেছে পরে। যখন আমি চণ্ডী মাইজির থানে ছিলাম, তখনই গাড়িটা এসে থাকবে।

কাকেও ভোরবেলা ডেকে এনে পিচরাস্তার ওই জায়গাটাতে অতর্কিতে গুলি করা হয়েছে। ওখান থেকে বাঙালিটোলার দক্ষিণের শেষ বাড়িটা বড় জোর তিনশো-সাড়ে তিনশো মিটার দূরে। চিন্তাযোগ্য বিষয়।

চৌপটলালকে বাজারের টাকা দিয়ে বেরিয়েছিলাম। সে সাইকেলে বাজার থেকে ঠিক আটটায় ফিরে আমার জন্য অপেক্ষা করেছে। আমাকে নদীর ওপারে দেখামাত্র কেরোসিন কুকারে কফির জল চড়িয়েছে। বারান্দায় বসে কফিপান করে ধাতস্থ হলাম। তারপর চুরুট ধরিয়ে বাইনোকুলারে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকটা খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। কোথাও কোনও মানুষ নেই। অবশ্য আসলাম এতক্ষণে চণ্ডী মাইজির থানে প্রার্থনা করতে এসে থাকবে।

চৌপটলাল এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কটার সময় ব্রেকফাস্ট করব। তাকে বললাম, আধঘণ্টার মধ্যে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি আসলাম খাঁ নামে কোনও লোককে চেনো?

চৌপটলাল বলল—জি কর্নিলসাব! তাকে দেখলেন আপনি?

—হ্যাঁ। গড়ের কাছে ব্রিজের উপর।

—হুজুর কর্নিলসাব! চৌপটলাল চাপা গলায় বলল—উও বহত ধড়িবাজ আদমি। কুঠা আসলাম হামার কাছে ভি আসে। গপ্‌সপ্ করে। লেকিন উও খুনী ছিল। পাঁচবরষ জেলে ছিল। তারপরেতে কুঠ হলো। চণ্ডীমাইজির শাপ লাগল। কাহে কী, উও চণ্ডীমাইজিকি থানের সামনে কাল্লুচাচাকে খুন করেছিল।

—কাল্লু কে?

—আসলামের চাচা। কাল্লু খাঁ কোচোয়ান ছিল। লটারিতে দশ হাজার রুপেয়া পেল। তো সেইজন্য আসলাম তাকে খুন করল। সেই রুপেয়া লিয়ে কাল্লু খাঁর বহু কালকাত্তা ভাগল।

—ঠিক আছে। তুমি ব্রেকফাস্ট রেডি করো।

হতে পারে এ ঘটনা সত্য। বরাবর দেখে আসছি মানুষের বাইরেটা দেখে কিছু চেনা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা রক্তাক্ত লাশ গাড়িতে বয়ে নিয়ে গিয়ে জলপ্রপাতে ফেলে দেওয়ার কথা জেনেও চুপ করে আছে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই।

নিজের আচরণে নিজেই অবাক হলাম। তারপর বাইনোকুলারে বাঙালিটোলা দেখতে থাকলাম। একটু পরে কাল বিকেলে দেখা সেই সালোয়ার কামিজপরা মেয়েটিকে বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বেরুতে দেখলাম। তার মুখটা উল্টোদিকে।

কিন্তু উঁচু জমি থেকে যে গতিতে সে সাইকেলে চেপে উত্তরে অদৃশ্য হলো, সেটা কি তার স্বভাব? মেয়েটি কি খেলোয়াড়?

চৌপটলাল ব্রেকফাস্ট আনল। তাকে বললাম—বাঙালিটোলার একটি মেয়েকে সাইকেল চালাতে দেখেছি। তাকে কি তুমি চেনো? সালোয়ার কামিজ পরা মেয়ে।

—জি কর্নিলসাব। উও তো ডাগদার চাউধরিকা বেটি আছে। কালেজমে লিখাপঢ়া করে। এখন তো ছুট্টি আছে।

—ওর নাম কী?

—তানিয়া। তার দাদা কালকাত্তাতে থাকে। পূজার ছুট্টিতে চলিয়ে আসে।

—বাঙালিটোলায় পুজো হয়?

—জি কর্নিলসাব। আমরেশ চাঠার্জিবাবুর কোঠিতে পূজা হবে। উনহি জমিন্দার ছিল। এখোন বহুত অসুবিস্তাতে আছেন।...

জড়তা কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যে-বেশে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, সেই বেশেই। চৌপটলালকে বলে এলাম, ফিরতে দেরি হলেও সে যেন চিন্তা করে না। পাথরের ব্রিজ পেরিয়ে বিপ্লবদের বাড়ি লক্ষ করে দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। বিপ্লবের সঙ্গে যেচে পড়ে আমার আলাপ করা দরকার। 'প্রকৃতিবিজ্ঞানী'-লেখা নেমকার্ড ওকে দেব। তারপর তাকে যা দেখেছি, খুলে বলব এবং এ ব্যাপারে পুলিশকে জানানোর জন্য ওর সাহায্য চাইব। কারণ কলকাতায় থাকলেও সে স্থানীয় ছেলে।

'স্যাটার্ন' মূর্তি আপাতদৃষ্টে বিপ্লবই চুরি করে এনেছে। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এনে দিয়েছে একটা রক্তাক্ত লাশ।

বাড়িটার সামনে গেট থেকে একফালি পথ পিচের রাস্তায় এসে পৌঁছেছে। গেটে বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি চোখে পড়ল। গেটটা চওড়া দেখে মনে হলো, ডাক্তার চৌধুরির নিশ্চয় গাড়ি ছিল।

সবে গেটের কাছে পৌঁছেছি, দু'জন বাঙালি ভদ্রলোক বাঁদিক থেকে উঁচু জমির উপর হেঁটে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালেন। আমি তাঁদের নমস্কার করলাম। তাঁরা আমাকে সায়েবট্যুরিস্ট ভেবেছিলেন। একজন ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করতেই দ্রুত বললাম—আমি বাঙালি। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। এটা বাঙালি এলাকা বলে এই বাড়ির কারও সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছিলাম।

দু'জনেই খুব অবাক হয়েছিলেন। প্রথম জন বললেন—আমাদের সৌভাগ্য। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি অমরেশ চ্যাটার্জি। একসময় এঁর পূর্বপুরুষ এখানকার জমিদার ছিলেন। আমার নাম পবিত্র নিয়োগী।

পবিত্রবাবুর হাতে আমার নেমকার্ড দিলাম। দু'জনে মুখতাকাতাকি করার পর

পবিত্রবাবু বললেন—আপনি রিটায়ার্ড কর্নেল? আলাপ হয়ে আনন্দ হলো। অমরেশ! তুমি এঁকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও। আমি দেখি, তানিয়ার মা কেন ডেকেছে।

ইতিমধ্যে একজন প্রৌঢ়া শীর্ণকায়া মহিলা গেট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে চমকে উঠলাম। তাঁর চোখে জল। করুণ মুখে তিনি বললেন—নিয়োগীদা! চাটুজ্যেমশাই! তানিয়াকে আপনাদের কাছে কখন পাঠিয়েছি। মেয়েটাকে নিয়ে পারা যায় না।

পবিত্রবাবু বললেন—তানিয়া ক্লাবে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। ক্লাবে বিলু নেই। ছেলেরা পুজোর সময় সারারাত ক্লাবে কাটায়। সতু বলল, কাল সন্ধ্যার পর বিলুকে নিউ টাউনশিপে যেতে দেখেছিল। নিউ টাউনশিপে বিলু তার মাসতুতো দাদার বাংলোয় থাকতে পারে। তানিয়া সেখানে খোঁজ নিতে গেল।

বললাম—কী হয়েছে?

অমরেশবাবু বললেন—বিলু ওঁর ছেলে। কলকাতা থেকে কাল পুজোর ছুটি কাটাতে এসেছে। কাল সন্ধ্যায় বেরিয়ে এখনও সে বাড়ি ফেরেনি। বউদি! বিলু আপনাকে কিছু বলে যায়নি?

বিলুর মা বললেন—না। ঘণ্টা দুই পরে আসছি বলে বেরিয়ে গেল। ও এমন তো করে না!

পবিত্রবাবু বললেন—আমার ধারণা ওর মাসতুতো দাদার বাংলাতেই আছে। দত্তরায়সায়েবের কোনও কাজে আটকে গেছে।

বিলুর মা বললেন—বরুণ এখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না। বরুণের বউ অবশ্যি আসে না। কিন্তু বিলু বরুণের বউয়ের কথায় বাংলোয় থেকে গেলে টেলিফোনে পাশের বাড়ির পাণ্ডেজিকে খবর দিতে বলত। পাণ্ডেজি বেরিয়েছেন। খবর নিয়েছি, বিলু ফোন করেনি।

ততক্ষণে আমি যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছি। বিলু যে বিপ্লব ছাড়া কেউ নয়, এবং দু'ঘণ্টা পরে আসছি বলে নিউ টাউনশিপে গেছে। এখনও ফেরেনি। মনে মনে বললাম, সেই রক্তাক্ত লাশটা যেন বিপ্লবের না হয়।

পবিত্রবাবু মিসেস চৌধুরির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা করুণ মুখে বললেন—আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। নিয়োগীদা! চাটুজ্যেমশাই! কর্নেলসায়েবকে নিয়ে আমার বাড়িতে আসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

পবিত্রবাবু বললেন—তাই চলুন কর্নেলসায়েব! বিলুর মা ভেঙে পড়েছে। একটিমাত্র ছেলে। আর ওই একটি মেয়ে। ডাক্তার চৌধুরি এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন। আমাদের মনে হয় না, তাঁর ছেলের কোনও বিপদ হবে। তা ছাড়া সে

তো এখানে থাকে না।

অমরেশবাবু বললেন—পুজোর সময় বিলু কলকাতা থেকে না এলে, বুঝলেন কর্নেলসায়েব? আমার বাড়ির পুজো যেন জমে না। ক্লাবের ছেলেরাও তত উৎসাহ পায় না। বিলু তার বাবার মতোই জনপ্রিয়।

গেটের পাশে একতলা ঘরটাতে একসময় ডিসপেন্সারি ছিল। একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার আছে। একপাশে ডিভান। বুঝলাম, একসময় ডাক্তারবাবু রোগীদের ওতে শুতে হতো। এখন সুন্দর একটা বেডকভারে ঢাকা দেওয়া আছে।

চেয়ারে বসে বললাম—পান্ডেজির বাড়ি থেকে বিলুর মাসতুতো দাদার বাংলোয় টেলিফোন করা যায় না?

পবিত্রবাবু বাঁকা মুখে বললেন—পান্ডেজি থাকলে অসুবিধা হতো না। ওর স্ত্রী শুচিবায়ুগ্রস্তা মহিলা। কাকেও ঘরে ঢুকতে দেবেন না। নিজেও ফোন করতে জানেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চা নিয়ে এল একটি কিশোরী। দেখে আদিবাসী মনে হলো। বিলুর মা ডিভানে বসলেন। তাঁর চোখ ছাপিয়ে জল আসছে মাঝে মাঝে। বারবার আঁচলে চোখ মুছছেন ভদ্রমহিলার এত বেশি উদ্বেগের কারণ কী থাকতে পারে? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

একটু পরে বাইরে নিচের রাস্তায় কাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে চড়াগলার কথাবার্তা শোনা গেল। পবিত্রবাবু বারান্দায় বেরিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন—এই বাবুয়া! কী হয়েছে রে?

উঁকি মেরে দেখলাম, চারজন অর্ধনগ্ন লোক থমকে দাঁড়িয়েছে। তাদের কাপড়টুকু ভিজে দেখা গেল। একজন চেঁচিয়ে বলল—দুধিয়াসর্‌মে একঠো লাশ হামাদের মছলির জালে আটক হয়েসে বাবু। হামরা পুলিশকে খবর দিতে যাছি।

অবিনাশবাবু বললেন—জলপ্রপাতের নিচের জলায় লাশ? মিসেস চৌধুরি কেঁদে উঠলেন।...

তাহলে জলপ্রপাতের নিচে যে জলাশয়টি বাইনোকুলারে দেখেছি, তার নাম দুধিয়াসর। কথাটার মানে দাঁড়ায় 'দুধের সরোবর'। দুধের মতো সাদা ফেনিল জলরাশির জন্য সম্ভবত এই নাম। বাইনোকুলারে জেলেদের আমি দেখতে পাইনি। হয়তো তারা বাঁকের মুখে গাছপালার আড়ালে ছিল।

জেলেদের মুখে লাশের খবর পেয়ে অমরেশবাবু বা পবিত্রবাবুর কোনও উত্তেজনা লক্ষ করিনি। শুধু বিপ্লবের মা কান্নাকাটি করছিলেন। একটু পরে তানিয়া

যখন সাইকেলে চেপে বরুণের বাংলো থেকে ফিরে এসে জানাল, বাংলোর কেয়ারটেকার রামপ্রসাদ বলেছে, বিলু সেখানে যায়নি এবং বাংলোতে বরুণ বা তার স্ত্রী কেউ আসেনি, তখন প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের মধ্যে একটু ব্যস্ততা লক্ষ করেছিলাম। আর তানিয়া দুধিয়াসরে লাশের খবর পেয়েই সাইকেলে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পরে পবিত্রবাবুর কথায় অমরেশবাবু বলেছিলেন—চলো পবিত্র! গাড়ি বের করি গে। লাশটা দেখা দরকার।

এই উত্তেজনার সময় আমি একলা হয়ে গিয়েছিলাম। নিচের রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা যাওয়ার পর একটা সাইকেল রিকশো পেয়েছিলাম। তারপর বসতি এলাকা এবং বাজার ছাড়িয়ে নিউ টাউনশিপের পশ্চিমপ্রান্তে নদীর ধারে ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছেছিলাম।

একটা টিলার মাথা কেটে ট্যুরিস্ট লজ গড়া হয়েছে। লাউঞ্জ আছে। ম্যানেজার রাজেশ শর্মা আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। অভ্যর্থনা করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর একজন পরিচারককে ডেকে কফি আনতে বললেন। আমি বললাম—যেজন্য এসেছি, আগে বলে নিই।

রাজেশ শর্মা বললেন—কোনও অসুবিধা হয়েছে কি?

—না মিঃ শর্মা। আমি সুন্দর জায়গায় আছি তো কলকাতায় ফিল্মমহলে শুনে এসেছি, এই এলাকায় একজন বাঙালি ফিল্ম ডাইরেক্টর শ্যুটিং করতে এসেছেন। তাঁরা কি এখানে উঠেছেন?

—না তো! ফিল্মপার্টি এলে জানতে পারতাম। এখানে শ্যুটিং করার জন্য ফিল্মের লোকেরা আসে কিন্তু তেমন কোনও দল আসেনি।

—আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত?

—অবশ্যই নিশ্চিত। আগে বুকিং না করে তো কেউ এই লজে আসে না!

—বাই এনি চান্স, শৈবাল ব্যানার্জি নামে কেউ কি এসেছেন?

—শৈবাল ব্যানার্জি! এক মিনিট। বলে তিনি টেবিলে বসানো সুইচ টিপলেন। মৃদু ঘণ্টা বাজল। একটু পরে এক যুবক দরজার পর্দা তুলে বলল—স্যার?

—প্রকাশ! তুমি রেজিস্টার চেক করে দেখ তো, কলকাতা থেকে শৈবাল ব্যানার্জি নামে কোনও বাঙালি ভদ্রলোক লজে এসেছেন কি না?

আমি বললাম—এলে তাঁর গতকাল বিকেল বা সন্ধ্যায় চেক বা ইন করার কথা।

প্রকাশ অদৃশ্য হলো। তারপর দু'পেয়ালা কফি আর এক প্লেট পটাটোচিপস রেখে গেল সেই পরিচারক। রাজেশ শর্মা বললেন—অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত লজ ভরতি থাকে। প্যাক্‌ডআপ একেবারে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর তত ভিড়

থাকে না। তবে বেশির ভাগই ব্যবসায়ী। বাঙালি ট্যুরিস্ট শীতের সময় ভিড় করে। বার্ড স্যাংচুয়ারি, লাখিয়া ফলস আর গড়ের জঙ্গল ছাড়া এখানে—হ্যাঁ, চণ্ডীমাইজির থান একটা বাড়তি আকর্ষণ!

প্রকাশ পর্দা তুলে মুখ বাড়িয়ে বলল—না স্যার। শৈবাল ব্যানার্জি নামে কেউ আসেননি। কলকাতা থেকে কয়েকজন বাঙালি অবশ্য সপরিবারে এসেছেন। তাঁরা কেউ দু'দিন আগে, কেউ তিন-চারদিন আগে। কাল কেউ আসেননি।

—ঠিক আছে। তুমি যাও। রাজেশ শর্মা আমার দিকে ঘুরলেন—মিঃ ব্যানার্জি কি আপনাকে এখানে আসবার কথা বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। সম্ভবত উনি এখানে জায়গা না পেয়ে অন্য কোথাও উঠেছেন। এখানে ভালো হোটেল নিশ্চয় আছে?

—নিউ টাউনশিপে দুটো বড় হোটেল আছে। কয়েকটা ছোট হোটেলও আছে। সেগুলোতে সাধারণ মানুষেরা ওঠে। শস্তা বাজে হোটেল।

—বড় হোটেল দুটোর নাম কী?

—তিলোত্তমা আর সানশাইন। সানশাইনকে থ্রিস্টার বলা যায়।

—মিঃ শর্মা! প্লিজ যদি প্রথমে তিলোত্তমা এবং তারপর সানশাইনে টেলিফোন করে জেনে নিন—

—কোনও সমস্যাই নয়। বলে টেবিলের কাচের তলায় লেখা নাম্বার দেখে রাজেশ শর্মা রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন—তিলোত্তমা?...আমি ট্যুরিস্ট লজের রাজেশ শর্মা বলছি।...মর্নিং মিস চন্দ্রাণী! একটা জরুরী খবর চাইছি।...থ্যাংকস। গতকাল মিঃ শৈবাল ব্যানার্জি নামে কেউ কি ওখানে এসেছেন?...ও কে। অপেক্ষা করছি।

অপেক্ষা করতে করতে কফি শেষ করলাম। চুরুট ধরালাম। ঈষৎ উত্তেজনা টের পাচ্ছিলাম। শৈবাল ব্যানার্জি দৈবাৎ বাহারামগড়ে এলেও তাকে নিয়ে কী করব এখনও জানি না।

—মিস্ চন্দ্রাণী! আমি আছি। বলুন।...পেলেন না? আপনি নিশ্চিত?...ও কে ও কে। ধন্যবাদ।

রিসিভার রেখে রাজের শর্মা বললেন—না। ওই নামে কাল তিলোত্তমায় কেউ আসেননি। এমনকি কলকাতার কোনও বাঙালিই আসেননি। এবার সানশাইনে দেখছি।...

হোটেল সানশাইনেও কোনও শৈবাল ব্যানার্জি নেই। গতকাল কলকাতার কেউই সেখানে ওঠেননি। এবার মনে হলো, খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজছি। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, জলপ্রপাতের লাশটা সত্যিই বিপ্লবের হলে আমার থিওরিটা

দাঁড়াচ্ছে এরকম : শৈবাল ব্যানার্জি বিপ্লবের সাহায্যে 'স্যাটার্ন' মূর্তি চুরি করিয়েছিল এবং কথামতো এখানে এসে বিপ্লব তাকে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করতে বলেছিল।

মূর্তিটার জন্য বিপ্লব টাকা চেয়েছিল। তাকে টাকা দেবার ছলে সেই পিচরাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে শৈবাল তাকে গুলি করে মেরে মূর্তি হাতিয়েছে।

কিন্তু এমনটা যদি সত্যিই হয়, তা হলে মূর্তি হাতানোর পর বিপ্লবকে খুন করে গতরাত্রেই শৈবাল ব্যানার্জি কলকাতা ফিরে যায়নি কেন? ভোরবেলা একটা গাড়ি ভাড়া করে বিপ্লবের লাশ পাচার করে সে কি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল?

থিয়োরি শুধু থিয়োরি! যতক্ষণ না তথ্যপ্রমাণ হাতে আসছে, এর মূল্য নেই। কিন্তু আমার অভ্যাস, আগে থিয়োরি খাড়া করে পা বাড়াই।

রাজেশ শর্মা আবার রিসিভার তুলে চাপা স্বরে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর কথা শেষ হলে বললাম—এখানে নিশ্চয় ভাড়ায় গাড়ি পাওয় যায়?

—যায়। আমরা বোর্ডারদের জন্য গাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিই। রঘুপতি ট্রান্সপোর্ট কম্পানির সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া আছে।

আমি পকেট থেকে খুদে নোটবই বের করে বললাম—এই নাম্বারের ক্রিমরঙা অ্যামবাসাডার কি ওই ট্রান্সপোর্টের আছে?

রাজেশ শর্মা অবাক হয়ে বললেন—নাম্বারটা পেলেন কোথায়?

—এই গাড়িতে চেপে কারা আজ ভোরে জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলেন। দূর থেকে বাইনোকুলারে দেখে ভেবেছিলাম শৈবাল ব্যানার্জি ফিল্মের লোকেশন দেখতে যাচ্ছেন।

—এক মিনিট। চেক করে নিই। এই ব্যাপারটা আমি নিজে দেখাশোনা করি। ভাড়ার দায়িত্বও আমার। বলে রাজেশ শর্মা টেবিল থেকে একটা মোটা বাঁধানো রেজিস্টার তুলে নিলেন। তারপর পাতা উল্টে দেখে নিয়ে মাথা নাড়লেন।—না। আজ লজ থেকে কেউ নাম্বারের গাড়ি নিয়ে যাননি।

—আরও ট্রান্সপোর্ট কম্পানি থাকতে পারে।

—আছে। ট্যুরিস্টদের বা অন্য কারও দরকার হলে গাড়ি ভাড়া এখানে পাওয়া যায়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কেউ-কেউ স্বনামে বেনামে দু-তিনটে গাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটান।

—এই সব গাড়িতে কম্পানি বা ব্যক্তিবিশেষের ড্রাইভার নিশ্চয় থাকে?

—অবশ্যই। আমি বা কোনও হোটেল গ্যারান্টার হলেও নানাকারণে প্রত্যেকটা গাড়ির ড্রাইভার এবং একজন হেল্পার থাকে। পথে দৈবাৎ গাড়ি খারাপ হলে তা মেরামতের ব্যবস্থা থাকে। গাড়ির মেকানিজম জানা দক্ষ ড্রাইভারই দেওয়া হয়।

—ধন্যবাদ মিঃ শর্মা! আমি উঠি।

লাউঞ্জ পেরিয়ে দরজা অবধি আমাকে পৌঁছে দিতে এসে হঠাৎ মিঃ শর্মা বললেন—আপনি এক কাজ করতে পারেন। যদি মিঃ শৈবাল ব্যানার্জির সঙ্গে আপনার দেখা করার দরকার থাকে, আপনি বাঙালিটোলায় খোঁজ নিতে পারেন। ওখানে কোনও-কোনও বাড়ি স্থানীয় লোকেরা কিনে নিয়েছে। তারাও বাড়ি ভাড়া দেয়। বাড়িতে কেয়ারটেকার এবং রান্না করার জন্য লোকও আছে। এসব বাড়ি আপনার সহজে চোখে পড়বে। কারণ বাড়িগুলো নতুন মালিকরা মেরামত করেছেন। নতুন করে রঙ করা হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি।

রাজেশ শর্মার এ কথা বলার দরকার ছিল না। কারণ কথাটা আমার মাথায় আগেই এসেছিল। নিচের রাস্তায় গিয়ে একটা সাইকেলরিকশো ডাকলাম। ম্যাপে দেখে নিয়েছিলাম, বাঙালিটোলা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখান থেকে ওয়াটারড্যামে যাওয়ার প্রশস্ত এবং মসৃণ রাস্তা পূর্বে এগিয়ে গেছে। দক্ষিণে জলপ্রপাতের পর লখিয়া নদী ডাইনে অর্থে পূর্বে বাঁক নিয়েছে। তারপর নদীর অববাহিকায় ওয়াটারড্যাম গড়া হয়েছে। অনুমান করেছিলাম, ওখানে লখিয়ার নিচু অববাহিকায় আগে একটা বিস্তীর্ণ বিল ছিল। সাইকেলরিকশোতে যেতে যেতে রিকশোওয়ালার সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে দুধিয়াসরে একটা লাশ এবং পুলিশের ছুটোছুটির ঘটনা বলতেই ব্যগ্র ছিল। তারপর আমার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল, ওয়াটারড্যামের জায়গায় 'দরিয়া'-র মতো একটা জলা ছিল। পূর্বে আর দক্ষিণে নিচু দেহাত এলাকায় প্রতিবছর বন্যা হতো। তবে ড্যাম হওয়ার পর বন্যা আরও বেশি হচ্ছে। সরকারি 'অফসর'-লোক 'লিখাপঢ়া' জানতে পারে, নদীর 'কানুন' জানে না।

জ্যামের রাস্তার মোড়ে এসে রিকশোওয়ালা বলল, আমি ওয়াটারড্যামের ওদিকে পাখি দেখতে চাইলে সে কম ভাড়াতে আমাকে পৌঁছে দেবে। সে বানিয়ে বানিয়ে অদ্ভুত সব পাখিদের গল্প করছিল। কিন্তু আমি ড্যামের রাস্তায় চড়াই দিয়ে ওঠার পর বাঙালিটোলার পূর্বে তরঙ্গায়িত রুক্ষ প্রান্তরের সীমানায় একটা বয়স্ক বটগাছের তলায় তাকে থামতে বললাম। লোকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কুড়ি টাকার কমে সে নেবে না। অগত্যা তাকে টাকা দিয়ে বটগাছের তলায় ঘন ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটগাছটার তলায় একটা পাথরে সিঁদুর মাখানো আছে। কোনও দেবতার থান এটা। বর্ষার পর এখনও গাছটাতে ফল আছে। নিচে বটফল পিষে দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করেছে। শালিখ আর 'ছাতার' পাখিরা বটফল খাচ্ছে। ঝগড়া করছে। ছাতার বা ছাতারে পাখিকে বাংলার গ্রামাঞ্চলে 'সাতভাই' বলা হয়। আমি বাইনোকুলারে দেখতে পেলাম, রুক্ষ প্রান্তরের উত্তর-পূর্বে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত আর

বসতি আছে। ওয়াটারড্যাম থেকে সেচের জল সরবরাহ করা হয়। ক্যানেলের উঁচু পাড়ও দেখা যাচ্ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ওয়াটারড্যামের জল, সেচবাংলো এবং দক্ষিণে বার্ড স্যাংচুয়ারির একটা অংশ স্পষ্ট দেখা গেল। ড্যামের পাড়ে দেবদারু আর ইউক্যালিপ্টাস গাছ। কিছু মানুষ এবং মাঝেমাঝে কয়েকটা মোটর গাড়ি। সেচবাংলোর সুদৃশ্য লনে কয়েকজন সায়েব-মেমের জটলা দেখতে পেলাম। তারা স্যুইমিং পোশাক পরে ড্যামের জলে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

কিক্ষুক্ষণ পরে রক্ষ মাঠে কয়েকটা পলাশগাছ লক্ষ করে রাস্তা ছেড়ে সোজা সেখানে চলে গেলাম। কয়েকটা ছোট-বড় পাথর পড়ে আছে আশেপাশে। ছায়ায় বসে বাইনোকুলারে পশ্চিমদিকে বাঙালিটোলার বাড়িগুলো দেখতে থাকলাম। একটা বাড়ির পিছনে আমবাগান আছে। দোতলা বাড়িটা গাছপালার ফাঁকে খুব স্পষ্ট। খোলা জানালার ধারে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও বাইনোকুলারে তাকে সুস্পষ্ট দেখতে পেতাম। দূরত্ব বড়জোর শতিনেক মিটার। বাড়িটা নতুন রঙ করানো হয়েছে এবং আম-বাগানে তিনটে চেয়ার পেতে তিনজন বসে আছে। আমগাছের গুঁড়ি বাইনোকুলারে বাধা হয়ে উঠেছে। একটু সরে ডাইনে গেলাম, এবার দু'জন স্পষ্ট হলো। এক যুবতী এবং একজন বয়স্ক বেঁটে লোক। যুবতীর একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল। পরনে জিনস এবং টি-শার্ট। বয়স্ক বেঁটে লোকটির পরনে স্যুট-টাই। উরুর উপর একটা ব্রিফকেস। তৃতীয় জনকে দেখতে হলে আমাকে ডাইনে ফাঁকা জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু দৈবাৎ ওদের চোখে পড়তে পারি। বাইনোকুলারে এভাবে কাকেও দেখা আইনসম্মত নয়। ওরা কারা তা জানি না। কিন্তু ওদের এভাবে দেখছি, সেটা টের পেলে ওরা কেউ নিজে কিংবা বাড়ির ভৃত্যকে পাঠিয়ে আমাকে চার্জ করতে পারে। তাই পলাশগাছের আড়ালে একটা পাথরে বসে রইলাম। চুরুট ধরিয়ে খালি চোখে লক্ষ রাখলাম। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও তীক্ষ্ণ এবং বাইনোকুলার ব্যবহার করলেও চোখের কোনও ক্ষতি এযাবৎ হয়নি। এজন্য আমার শরীরে নিশ্চয় অতিরিক্ত প্রতিরোধক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করি। কিছুক্ষণ পরে তিনজনই আমবাগান থেকে উঠে গেল। তারা বাড়ির ভিতর ঢুকল সম্ভবত। সমস্যা হলো, শৈবাল ব্যানার্জিকে আমি কখনও দেখিনি। সে একটি মেয়েকে নিয়ে সকালে ট্যাক্সি চেপে বেরিয়ে গিয়েছিল—শুধু এটুকুই আমার জানা। বাকিটা আমার থিয়োরি।

আশ্বিনের রোদ এখন প্রখর হয়েছে। আবার বাইনোকুলারে আমবাগানটা দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল, বাঁদিকের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা গলিরাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়ে একটি দেহাতি মেয়ে আর একটা দশ-বারো বছর বয়সী ছেলে কয়েকটা গরু নিয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল। হাফপ্যান্টপরা ছেলেটি একটা ছোট লাঠি হাতে গরুগুলোকে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির গায়ে গেঞ্জিও

নেই। মাথায় একরাশ চুল। এই রুক্ষ অনাবাদি মাঠে নিশ্চয় কোথাও ঘাসের জমি আছে। মেয়েটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ঝুঁকি নিলাম। পলাশতলা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। সে আমাকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু চিন্তা করে আমি আমার জলের বোতলের জলটা ফেলে দিলাম। কাছে গিয়ে ইচ্ছে করেই ইংরেজি-হিন্দী মিশিয়ে তাকে বললাম—আমার তেষ্টা পেয়েছে। এখানে কোথায় জল পেতে পারি?

মধ্যবয়সী মেয়েটি আমাকে সায়েব ভেবেছে, তাতে ভুল নেই। সে কথাটা বুঝতে পেরে আমাকে তার সঙ্গে যেতে ইশারা করল। গলিরাস্তার পর বাঁদিকে একটা বাড়ি। বাড়ির এই দরজাটা পিছনের দিকে। অর্থাৎ খিড়কির দরজা। ভিতরে গোয়ালঘর আর একটা একতলা ঘর দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটা পরিষ্কার করে মাজাঘষা কাঁসার ঘটিতে জল এনে দিল। খালি বোতলে জলটা ভরে নিয়ে ছিপি এঁটে পিঠের কিটব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলাম। তারপর তার ঘটিটা চেয়ে নিয়ে বাকি জলটুকু মুখের কাছে ডান হাত রেখে আনাড়ির মতো পান করলাম।

মেয়েটির পিছনে পাজামা-পাঞ্জাবিপরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে সায়েবি মার্কিন ইংরেজিতে সম্ভাষণ করলাম—হাই! আ লট অব থ্যাংকস্ ফর ইওর কাইন্ডনেস। আই ওয়াজ সো থার্স্টি ইনডিড।

ভদ্রলোক বললেন—উই আর ইন্ডিয়ান স্যার। দিস ইজ আওয়ার রিলিজিয়াস ডিউটি।

—ও আই নো। আই নো ওয়েল। হোয়াটস ইওর নেম মিস্টার?

—আই অ্যাম বীরেন রায় স্যার।

—মাই গুডনেস! আই হ্যাভ আ ফ্রেন্ড ইন ক্যালকাট্টা। হি ইজ অলসো বীরেন। বীরেন বোস। হি ইজ আ বেঙ্গলি। আর ইউ?

—ইয়েস স্যার! মাই ফোরফাদার কেম হিয়ার ফ্রম বেঙ্গল।

—বেঙ্গলিজ আর কালচার্ড! আই হ্যাভ রেড ইওরস গ্রেট পোয়েট ট্যাগোর।

—নোবেললরিয়েট রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর।

—দ্যাটস রাইট! বলে পাশের বাড়িটা দেখিয়ে বললাম, আই থিংক্, দ্যাট হাউস বিলংস্ অলসো টু আ বেঙ্গলি।

—আই সি! হোয়াটস হিজ নেম?

—মহাবীর আগরওয়াল। হি ইজ এ বিগ বিজনেসম্যান। হি লিভস ইন দা নিউটাউনশিপ। ট্যুরিস্টস কাম হিয়ার। দে স্টে হিয়ার অন রেন্ট।

আমার আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। বীরেনবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। গলিরাস্তার শেষে গিয়ে দেখলাম, ঢালু হয়ে নিচের পিচরাস্তায় এটা মিশেছে। ডাইনে মহাবীর আগরওয়ালের বাড়ির গেট থেকে সবে একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি বেরুচ্ছে। সেই ক্রিমরঙের অ্যামবাসাডার। সেই একই নম্বর।

এ গাড়ি যারই হোক, সে কাকেও পরোয়া করে না। নাকি কেউ গাড়িটার কীর্তিকলাপ লক্ষ করেনি ভেবেই উদ্বেগহীন? গাড়িতে সেই সাদাচুলের বয়স্ক লোকটিকে দেখতে পেলাম। গেটের কাছে জিনস এবং নীল টি-শার্ট পরে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। বয়স, অনুমান করলাম, চল্লিশ-বেয়াল্লিশের মধ্যে। চেহারায় ফিল্মহিরোর মতো সৌন্দর্য। চুলের কেতাও তাই-ই। মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না।

আমি দ্রুত তৈরি হয়ে নিলাম। আমাকে দেখে ভদ্রলোক অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। আমি হনহন করে তাঁর সামনে গিয়ে সোজা বললাম—আমার যদি ভুল না হয়, আপনি বিখ্যাত ফিল্ম ডাইরেক্টর মিঃ শৈবাল ব্যানার্জি!

—আপনি কে?

—আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। কলকাতার জয়শ্রী সিনে স্টুডিয়োর ম্যানেজার গোপাল কুণ্ডুকে আপনি নিশ্চয় চেনেন। আপনার একটা ফিল্মের সুখ্যাতি শুনেছিলাম তাঁর কাছে। আপনি এখানে নিশ্চয় নতুন ছবির জন্য লোকেশন দেখতে এসেছেন।

—গোপাল কুণ্ডু কি আপনাকে বলেছে আমি এখানে এসেছি?

—হ্যাঁ। বলে আমি শৈবাল ব্যানার্জিকে আমার নেমকার্ড দিলাম।

কার্ডটা দেখে নিয়ে শৈবাল আমাকে বলল—থ্যাংকস। আমি এখন একটু ব্যস্ত। সে গেট বন্ধ করে ভিতরে অদৃশ্য হলো।

গেটটা নিরেট লোহার পাতে তৈরি। শৈবাল এমনভাবে গেটটা বন্ধ করল যেন শব্দটা আমার গালে একটা জোরালো থাপ্পড় মারল। নিচের রাস্তায় ডাকবাংলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে বিপ্লবদের বাড়ির সামনে একটা ভিড় দেখলাম। ভিড়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। একটু দাঁড়িয়ে ইশারায় একটি ছেলেকে ডাকলাম। সে উঁচুতে দাঁড়িয়ে আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—বোলিয়ে স্যার?

—এখানে কী হয়েছে?

বাংলায় কথা শুনে সে বাংলায় বলল—এই বাড়ির একটা ছেলে ওয়াটারফলসে পড়ে মারা গেছে।...

আমার থিয়োরিটা মোটামুটি ঠিকই ছিল। ডাকবাংলোতে ফিরতে পৌনে একটা

বেজে গিয়েছিল। চৌপটলাল আমাকে দেখে রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠস্বরে বলে উঠেছিল—বহুত্ খতরনাক কর্নিলসাব। আপ শুনা?

বারান্দায় উঠে বললাম—ডাক্তার চৌধুরির ছেলে দুধিয়াসরে ডুবে মারা গেছে। এইমাত্র শুনে এলাম।

—নেহি কর্নিলসাব। কৈ উসিকো মার ডালা। উসকো লাশ ওয়াটারফলসমে ফেক দিয়া।

—বলো কী? তাকে খুন করেছে কোথায় শুনলে তুমি?

—আধাঘণ্টা হোবে, আমবুলান্স গাড়িতে পুলিশ লাশ লিয়ে গেসে। হামি ভজুয়ার কাছে খবর শুনল। তারপরে আসলাম খাঁ আসল খৈনি মাঙতে। সে-ভি বলল। হুজুর কর্নিলসাব! পুলিশ কি সাথ ছুপা খবর করে আসলাম। সে দুধিয়াসরে গিস্‌ল। খুনী মোটরগাড়ি লেকে ওয়াটারফলসকি পাশ গিস্‌ল। গাড়ি ভিত্‌রে লাশ ছিল। ফেক দিসে পানিমে।

—ঠিক আছে। তুমি লাঞ্চ রেডি করো। আমি একটায় খেয়ে নেব।

আমার সন্দেহ হলো, পুলিশ তাহলে গাড়ির চাকার দাগ খুঁজে পেয়েছে। আসলাম খাঁ কি তা হলে আমাকে সব কথা বলেনি? চৌপটলাল বলল, কুঠো আসলাম পুলিশকে গোপন খবর দেয়। মাটির রাস্তায় তাকে আমি রক্তের চিহ্ন দেখিয়েছি। পুলিশকে সে তাহলে সেই চিহ্নগুলোও দেখিয়ে দিয়েছে। প্রপাতের পাশে সমতল ঘাসে ঢাকা জমিতে গাঢ় ছায়া ছিল। ব্রিজের পশ্চিম পাড়ে গড়ের জঙ্গলে আড়াল থেকে গাড়ির নম্বর কি পড়তে পেরেছিল আসলাম? সম্ভবত নয়। প্রপাতের কিনারায় পাথরের চাঙড় ঘেঁষে উঁচু কাশঝোপ আছে। গাড়ির ডিকি তোলা ছিল। তাছাড়া গাড়িটার মুখ ছিল উত্তর দিকে। ডিকি দক্ষিণ দিকে। এ অবস্থায় পশ্চিম দিকে নম্বর দেখার সম্ভাবনা কম। তবে সে শৈবাল ব্যানার্জিকে দেখেছে, এতে কোনও ভুল নেই। শৈবাল এখনও সেই পোশাকে আছে। সে এত নির্বোধ হবে কেন? অবশ্য নীল টি-শার্ট আর জিনসপরা লোক বাহারামগড়ে থাকা সম্ভব। তা ছাড়া আগরওয়াল ভদ্রলোক বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। কাজেই শৈবালের দিক থেকে কোনও আশঙ্কার কারণ নেই। আমার কাছে শুধু এটাই ভাইটাল প্রশ্ন, স্যাটার্নদেবের মূর্তি কি আগরওয়ালই কিনতে চেয়েছিলেন?

মূর্তিটা বিপ্লব চুরি করে এনেছিল এবং টাকার অংশ যতটা দাবি করেছিল, তা দিতে রাজি হয়নি শৈবাল। মূর্তি না দেওয়ার জন্যই শৈবাল ব্যানার্জি হঠাৎ খেপে গিয়ে তাকে গুলি করে মেরেছিল। এই থিয়োরিটা দাঁড় করানো যায়।

কিন্তু রক্ত দেখে আমার ধারণা হয়েছে খুব ভোরের দিকেই খুন করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি প্রাতঃভ্রমণে বেরুনোর বেশ কিছুক্ষণ আগে।

পরের প্রশ্ন, বিপ্লব কি আগরওয়ালের বাড়িতে শৈবাল ব্যানার্জির সঙ্গে রাত

কাটিয়েছিল? শৈবালের সঙ্গিনী যুবতী। বিপ্লবকে ফাঁদে ফেলার জন্যই কি শৈবাল তাকে এনেছিল?

পোশাক বদলে হাতমুখ রগড়ে ধুয়ে লাঞ্চের পর বারান্দায় বসে এইসব ভাবতে ভাবতে একটা চুরুট শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তারপরই থিয়োরি অগোছাল মনে হলো। মূর্তি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত বিপ্লবকে খুন করলে মূর্তি পাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই, একথা বোঝবার মতো বুদ্ধি কি শৈবালের ছিল না? নিশ্চয় ছিল। তা হলে বিপ্লবকে তার হত্যা করার মোটিভ কী?

দুটো নাগাদ আবার আমি যথারীতি ক্যামেরা বাইনোকুলার গলায় ঝুলিয়ে পিঠে কিটব্যাগ এঁটে বেরিয়ে পড়লাম। এখন সাধারণ জুতোর বদলে পাহাড়-জঙ্গলে বেড়ানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি জুতো জোড়া পরে নিলাম।

পাথরের ব্রিজ পেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো, স্যাটার্নদেবের মূর্তি হাতাতে পারেনি বলেই শৈবাল ব্যানার্জি এখনও বাহারামগড়ে আছে। এমন আশঙ্কাও করা যায়। সে বিপ্লবের বাড়িতে হানা দেওয়ার জন্য, প্রতীক্ষা করছে। ও-বাড়িতে এক রুগ্না প্রৌঢ়া মহিলা আর আঠারো-উনিশ বছর বয়সী একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। কাজের মেয়েটি থাকা-না-থাকায় কিছু যায়-আসে না। আজ রাত্রে যদি সম্ভব না হয়, কাল রাত্রে শৈবাল ব্যানার্জি হানা দিতে পারে। এখানে আগরওয়ালের লোক তাকে সাহায্য করবে।

ব্রিজ পেরিয়ে আমি বাঁদিকে ঘুরলাম। বাঙালিটোলার নিচের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে বিপ্লবদের বাড়ির কাছাকাছি দাঁড়ালাম। এখন বাড়ির সামনে কোনও লোক নেই। একতলা ঘরটার দরজা বন্ধ। জানালাও বন্ধ। গেটের ভিতর ফুলের গাছ আর বাউন্ডারি ওয়ালের ওদিক থেকে মাথা তুলে আছে পেয়ারা, আম, সফেদা এইসব ফলের গাছ। সোজা উঠে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ালাম। সেই কিশোরী আদিবাসী মেয়েটি তারে কাপড় মেলে দিচ্ছিল। সে আমাকে দেখে পুতুল হয়ে গেল। ইশারায় তাকে ডাকলাম।

সে কেমন চোখে তাকিয়ে গেটের কাছে এলে বললাম—মাইজিকো বোলাও। বোলো, কর্নেলসাব আয়া।

মেয়েটি বলল—মাইজিকি তবিয়ত আচ্ছি নেহি। শোকে রাহা হ্যায়।

—তানিয়া কাঁহা?

—মালুম নেহি।

ইচ্ছে করেই গলা চড়িয়ে কথা বলছিলাম। এবার মিসেস চৌধুরিকে সামনে দোতলা ঘরের বারান্দায় দেখতে পেলাম। তিনি মেয়েটিকে গেট খুলে আমাকে ভিতরে নিয়ে যেতে বললেন।

আমি কাছে গেলে বিপ্লবের মা ভাঙা গলায় বললেন—বসুন কর্নেলসায়েব।

বারান্দার চেয়ারে আমি বসলাম। তারপর বললাম—আপনি বসুন। আপনার সঙ্গে কতকগুলো দরকারি কথা আছে।

কপালে মৃদু থাপ্পড় মেরে মিসেস চৌধুরি একটা তক্তাপোশে বসলেন। বললেন—আমার কোন জন্মের পাপ! স্বামীকে হারিয়েছিলাম। এবার ছেলেকেও হারালাম। কর্নেলসায়েব! ঠাকুর জানেন, জ্ঞানত আমি কারও ক্ষতি করিনি। অথচ আমিই আজ সর্বহারা!

—মিসেস চৌধুরি! আপনার মেয়ে তানিয়াকে দেখেছি। শক্ত মনের মেয়ে। তো কলকাতায় নাকি আপনার দিদি না বোনের ছেলে আছে। তার নাকি এখানে কারখানাও আছে। বাংলো থাকার কথা তো শুনে গেছি। আপনি কি কলকাতায় খবর পাঠিয়েছেন?

—পবিত্রদা ট্রাঙ্ককল করেছিল। লাইন পাওয়া কঠিন। আমার দিদির ছেলে বরুণ বিদেশে গেছে। বউমা ফোন ধরেছিল। সে কাল সকালের মধ্যে এসে পৌঁছুবে বলেছে।

—শুনলাম, বিপ্লব বরুণবাবুর বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত?

—যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। বছরে দু'বার আসত বিলু। পুজোর সময় আর জুন মাসে। পুজোর সময় দু'সপ্তাহ থাকত। কিন্তু তাকে কেউ গুলি করে মেরে নদীতে ফেলে দেবে, কল্পনাও করিনি কর্নেলসায়েব।

মিসেস চৌধুরি আঁচলে নাক আর চোখ মুছলেন। বললাম—এখানে কি ওর কোনও শত্রু ছিল?

—অসম্ভব। ওকে সব্বাই ভালবাসত। এখানকার কেউ একাজ করেনি।

—কলকাতায় ওর কোনও শত্রু আছে এমন কথা কি বিপ্লব আপনাকে বলেছিল?

—না, না। বরুণের কাছে তাহলে কোনও সময় আভাস পেতাম। বরুণ আমাদের সঙ্গে গতবছর দেখা করতে এসেছিল। বলেছিল, বিলুকে সে তার ফ্যাক্টরির ম্যানেজার করবে। বরুণের বউ একটু দেমাকি মেয়ে। একবার মাত্র এসেছিল বরুণের সঙ্গে। কিন্তু বিলু চিঠিতে তার খুব প্রশংসা করত। তবে তানিয়া—

উনি চুপ করলে বললাম—বলুন মিসেস চৌধুরি। আমি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল। আমার কিছু ক্ষমতা আছে। বিলুর হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেবার জন্য আপনার সাহায্য চাই।

মিসেস চৌধুরি আমার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামালেন। বললেন—তানিয়া ক'মাস আগে একদিন বলেছিল, বরুণের বাংলোতে বউদি এসেছে। তার সঙ্গে

একটা লোক। বউদি বলল, ফিল্মের লোক। আউটডোর শ্যুটিংয়ের লোকেশন দেখতে এসেছেন।

—নাম বলেনি?

—তানিয়া জানে, আমি ভুলে গেছি। তারপর বরুণ এখানে এলেও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। বিলুকে তানিয়া চিঠিতে কথাটা জানিয়েছিল। বিলু লিখেছিল, তোরা মফঃস্বলের গেঁয়ো মেয়ে। শহরের মেয়েদের চালচলনের খবর রাখিস না। বউদি যে ফিল্মের লোকের সঙ্গে গিয়েছিল, তা নাকি বরুণ জানে। তো দেখুন কর্নেলসায়েব! আমারও মনে হয়েছিল, এতে দোষের কী আছে? ফিল্মের লোকেদের সবাই খাতির করে। তাছাড়া বরুণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে।

বুঝলাম, মিসেস চৌধুরি মানসিকতায় আধুনিক। কিন্তু তিনি কি এমন কোনও গোপন তথ্য বিলু বা তানিয়ার কাছে টের পেয়েছিলেন, যাতে বিপ্লবের বিপদের আশঙ্কা ছিল? সকালেও একই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। এখন আবার তা জেগে উঠল। তা ছাড়া মিসেস চৌধুরি এখন যেন পুত্রশোক কিছুটা সামলে উঠেছেন। সে কি বিপ্লবের প্রতি তাঁর কোনও গোপন ক্ষোভের কারণে? বিপ্লব তার মাকে সম্ভবত তত গ্রাহ্য করত না। সে যে জেদি আর গোঁয়ার প্রকৃতির ছিল, তা কলকাতা থেকে হঠাৎ ওইভাবে চলে আসাতে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। হয়তো কোনও কারণে স্বাগতা বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্র আমার কাছে গোপন করেছিল।

ঠিক এই সময় মনে পড়ল, ভবানীপুরে বিপ্লবের ঘরের জানালা খোলার পর বাউন্ডারি পাঁচিলের ওধারে একটা দোতলা বাড়ির জানালায় এক তরুণীকে দেখেছিলাম। একটুখানি দেখা সেই মুখে যেন যুগপৎ ঔৎসুক্য আর বিহ্বলতার ছাপ ছিল। নিজের দেখার উপর আমার বিশ্বাস আছে। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, মেয়েটি কি বিপ্লবের প্রেমিকা? কলকাতায় এধরনের জানালা-প্রেম আকছার ঘটেই থাকে।

মিসেস চৌধুরি চায়ের জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁকে নিষেধ করে বললাম—পুলিশ কি আপনার কাছে কিছু জানতে এসেছিল?

—হ্যাঁ। চাটুজ্যেমশাই তখন আমার কাছে ছিলেন। বিলুর কলকাতার ঠিকানা নিল পুলিশ। তার সম্পর্কে নানারকম কথা জিজ্ঞেস করল। আমি যা জানি, সবই বললাম।

—তানিয়া বোধহয় তার দাদার দাহকর্ম শেষ হওয়ার পর বাড়ি ফিরবে।

—তাই মনে হচ্ছে আমার। বাঙালিটোলার সবাই মর্গে গেছে। চাটুজ্যেমশাই থানায় গেছেন শুনলাম।

—একটা কথা মিসেস চৌধুরি। কেউ সাদা পোশাকের পুলিশ—সি আই ডি কিংবা এই কেসের আই ও অর্থাৎ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার পরিচয় দিয়ে বিপ্লবের জিনিসপত্র দেখতে চাইলে তাকে কখনও বাড়ি ঢুকতে দেবেন না। চাটুজ্যেমশাই বা পাড়ার কোনও চেনা বিশ্বস্ত লোককে ডাকবেন। আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইবেন।

মিসেস চৌধুরি একটু অবাক হয়েছিলেন। বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন।

—কোনও অচেনা লোক, এমনকি ধরুন যদি সেই ফিল্মের ভদ্রলোকও আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বাড়ি ঢুকতে চান, তাঁকে ঢুকতে দেবেন না। প্লিজ মিসেস চৌধুরি। মনে রাখবেন এটা একটা মার্ডার কেস। আপনার এবং তানিয়ার সাবধান থাকা দরকার।

—আপনি ঠিকই বলেছেন কর্নেলসায়েব। গেটে তালা এঁটে রাখছি।

—আর একটা প্রশ্ন। বিলু কি আপনাকে বলেছে, সে আর বরুণবাবুর বাড়িতে থাকবে না এবং তাই সে তার সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে?

মিসেস চৌধুরি খুবই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কৈ না তো! বিলু তেমন কোনও কথা বলেনি। সঙ্গে শুধু একটা ব্যাগ এনেছিল সে। বরাবর যেমন আসে, তেমনই।

আমি একটুও অবাক হইনি। বিপ্লব পড়াশুনা ছেড়ে দেবে বলে তো চলে আসেনি। এটা খুবই সম্ভব, সে হোস্টেল বা কোনও বন্ধুর সাহায্যে একটা থাকার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল। তার ঘর দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, তার প্রচুর বই এবং আরও জিনিসপত্র ছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—আর একটা মাত্র প্রশ্নের জবাব চাইছি। প্লিজ গোপন করবেন না।

—না। আপনি বলুন কী জানতে চান?

—বিলু কি এমন কোনও আভাস দিয়েছিল, যাতে আপনার ধারণা হয়েছিল, সে বরুণবাবুর বাড়িতে আর থাকবে না।

মিসেস চৌধুরি উঠে দাঁড়িয়ে একটা থামে হাত রেখে আস্তে বললেন—বিলু বলেছিল, বরুণের বাড়িতে একটা চাকরানি আছে, সে-ই যেন বাড়ির মালিক। সবসময় তাকে অপমান করে। বরুণের বউ নাকি মেয়েটাকে খুব পাত্তা দেয়। ও বাড়িতে সে থাকবে না। সে-কথা শুনে আমি বললাম, বরুণকে বলিসনে কেন? বিলু বলল, বরুণকে বলে লাভ নেই। তো আমি বললাম, ও-বাড়িতে না থাকলে তোর পড়ার খরচ আর থাকা-খাওয়ার খরচ কে জোগাবে? তানিয়ার বিয়ে দিতে হবে। তার পড়াশুনার খরচও কম নয়। এই নিয়ে বিলুর সঙ্গে আমার একটু কথা-

কাটাকাটি হয়েছিল। কর্নেলসায়েব! খুলেই বলি। বিলু বরাবর একটু জেদি আর গোঁয়ার। বাবাকেই গ্রাহ্য করত না তো আমাকে!

বললাম—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনি যেন আমার কথাগুলো মনে রাখবেন। অচেনা হোক বা চেনা হোক, কাকেও বিলুর ব্যাগেজে হাত দিতে দেবেন না। অবশ্য সত্যিকার পুলিশ হলে চাটুজ্যেমশাই বা পবিত্রবাবুকে ডাকবেন। বিলুর ব্যাগেজ খোলার সময় তাঁরা যেন উপস্থিত থাকেন। আপনার মেয়ে তানিয়াকে দেখে বুদ্ধিমতী মনে হয়েছে। তাকেও আমার কথা বলে সতর্ক করে দেবেন। চলি।

মিসেস চৌধুরি নিচে নেমে গেট অবধি আমাকে বিদায় দিতে আসছিলেন। গেটের কাছে পৌঁছে আবার বললাম—সম্ভব হলে বিলুর বন্ধুদের বলবেন, যেন রাত্রিবেলা আপনার বাড়িতে থাকে।

মিসেস চৌধুরি চমকে উঠেছিলেন। বললেন—কেন কর্নেলসায়েব?

—বিলুর খুনী রাত্রে আপনার বাড়িতে চুপিচুপি ঢুকতে পারে। কিন্তু না—বিলুর বন্ধুদের একথা যেন বলবেন না। শুধু বলবেন, আপনারা মা ও মেয়ে। এই পরিস্থিতিতে আপনাদের ভয় করছে।

—তানিয়াকে বলব না?

—অবশ্যই বলবেন। তবে সে যেন বিলুর বন্ধুদের কাছে কথাটা ফাঁস না করে।...

কথাটা বলেই আমি নিচের পিচরাস্তায় নেমে এলাম। ঘুরে দেখলাম, তখনও মিসেস চৌধুরী গেটের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বাহারামগড় বাজারের দিকে এগিয়ে যাবার সময় বাঁদিকে পশ্চিমে ঘন গাছপালার দিকে নেহাত খেয়ালবশে তাকালাম। ওদিকে বসতি নেই। একটা টিলার গায়ে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। সেই মুহূর্তে একটা মাছরাঙা পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডেকে উঠল। তারপর উড়ে লখিয়া নদীর জলে ছোঁ দিলে। ক্যামেরা তুলে তৈরি হলাম। সকালে শিকারি বাজপাখির কয়েকটা ছবি তুলেছি। মাছখেকো পাখিদের মাছধরার কৌশল নিয়ে সচিত্র একটা নিবন্ধ লেখার ইচ্ছে অনেকদিন থেকেই মাথায় আছে। অতএব এসব সুযোগ হারাতে চাইনে। মাছরাঙাটা ব্যর্থ হলেও তার কয়েকবার ছোঁ মারা এবং কয়েক সেকেন্ড জলের এক মিটার উপরে ভেসে থাকার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করলাম। তারপর কয়েক পা এগিয়েছি, অদূরে মহাবীর আগরওয়ালের বাড়ির সামনে একটা লালরঙের মারুতি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। সদ্য বাটিকের চিত্রবিচিত্র ছাপের শার্ট আর ধূসর রঙের প্যান্টপরা শৈবাল ব্যানার্জি গাড়িতে ঢুকল। তার সঙ্গিনী যুবতীর পরনে এখন শাড়ি আর চাইনিজ ব্লাউজ। মেকআপ করা মুখে বিকেলের রোদ ঝলসে উঠল। মুখের গড়নে স্বাভাবিক সৌন্দর্য নেই, কিন্তু সুন্দরীদের ছাপ পড়েছে।

সে-ও গাড়িতে উঠল। তারপর গাড়িটা ঢালু পথে পিছিয়ে এসে নিচের রাস্তায় নামল এবং জোরে উত্তরে জনপদ এলাকার দিকে চলে গেল।

একটু ভেবে নিয়ে আমি হাঁটতে থাকলাম। তারপর মহাবীর আগরওয়ালের বাড়ির গেটে গেলাম। গেটে লাল লোহার পাত বসানো আছে, একথা আগেই বলেছি। আমি কলিংবেলের সুইচ খুঁজে পেলাম না। তখন জোরে থাপ্পড় মারলাম গেটের গায়ে। পর-পর তিনবার। তারপর গেটের উপরে একটা অংশ তুলে ধরে গুঁফো মধ্যবয়সী একটা লোক মুখ দেখাল। হিন্দিতে বলল—কাকে চাই স্যার?

আমাকে সায়েবসুবো ভেবেছে। অবশ্য আমি সত্যি বলতে কী, সায়েব প্রজাতিরই একজন হয়ে গেছি—তা আমার মনে অন্য এক মানুষ বাস করুক আর না-ই করুক। মৃদু হেসে বললাম—এটা কি মিঃ মহাবীর আগরওয়ালের কোঠি?

—হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আগরওয়ালসাব এখানে থাকেন না। নিউ টাউনশিপে তাঁর যে বাড়ি আছে সেখানে থাকেন। আপনি সেখানে গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে দেখিয়ে দেবে। তবে এখন তাঁকে তাঁর কম্পানির অফিসে পাবেন।

—আজ সকালে একটুর জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি একটা ক্রিমরঙের অ্যামবাসাডার গাড়িতে চলে গেলেন। একটু আগে দেখলাম, একটা লাল মারুতি ভ্যান এখান থেকে চলে গেল। অ্যামবাসাডার গাড়িটা দেখলে দৌড়ে চলে আসতাম। লাল গাড়িতে তা হলে কে গেলেন?

—কলকাতার একজন সিনেমা ডাইরেকটর সায়েব আর হিরোইন আগরওয়ালজির গেস্ট। তাঁদের জন্য আগরওয়ালজি এই গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সাদা অ্যামবাসাডার বিগড়ে গেছে। টেলিফোনে আগরওয়ালজি আমাকে খবর দিয়েছেন, সিনেমার সায়েবকে বলবে, তাঁর অ্যামবাসাডার গাড়ি গ্যারেজে গেছে। একটা লাল মারুতি ভ্যান পাঠাচ্ছি।

—কাল রাত্রে আমাকে এই কোঠিতে আগরওয়ালজি আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি আসতে পারিনি। খাওয়াদাওয়ার পার্টি নিশ্চয় খুব জমে উঠেছিল।

লোকটা অর্থাৎ গুঁফো মুখটা কী ভাবল জানি না, সে বলল—আগরওয়ালজির সঙ্গে দেখা করতে হলে নয়া বাজার এলাকায় যান।

বলে সে গেটের ওই অংশটা নামিয়ে দিল। আমি চলে এলাম। সম্ভবত আগরওয়াল লোকটি ধূর্ত। অ্যামবাসাডার গাড়িটা গ্যারেজে পাঠানো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। পুলিশের চর কুঠো আসলাম খাঁ ওই রঙের গাড়ি প্রপাতের ধারে দেখেছিল। কাজেই গ্যারেজে গাড়িটা পাঠিয়ে ঘষে রঙ তুলে অন্য রঙ লাগানোর অসুবিধে নেই। অবশ্য একই রঙের অনেক অ্যামবাসাডার গাড়ি বাহারামগড়ে নিশ্চয় আছে। তা হলেও পুলিশের জেরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য রঙ

বদলানোর চেষ্টা আগরওয়াল করতেই পারে।

আমি ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার রাজেশ শর্মার কাছে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে কী করব, এই ভেবে উল্টো দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে হাঁটতে থাকলাম। আজ রাত্রিটা অপেক্ষা করাই উচিত। কাল সকালের মধ্যে স্বাগতা দত্তরায়ের এসে পৌঁছুনোর কথা। হারানো স্যাটার্নদেবকে উদ্ধারের ব্যাপারে সত্যি বলতে কী, সে-ই আমার 'ক্লায়েন্ট'। একটু হাসি পেল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই এবং জয়শ্রী সিনে স্টুডিয়োর ম্যানেজার গোপাল কুণ্ডুও 'ক্লায়েন্ট' বলেন।

বরং আজকের বিকেলটা আমি প্রকৃতি বিজ্ঞানীর ভূমিকাই পালন করি। হাঁটতে হাঁটতে পিচরাস্তার বাঁকে গিয়ে গড়ের জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। তারপর হঠাৎ মাথায় ফিরে এল সেই তীব্র কৌতূহল। ইউক্যালিপ্টাস পাতার গড়ন পাথরটা যুগযুগব্যাপী ব্যালান্স রেখে ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এই রহস্যটা আমার বোঝা উচিত। তা ছাড়া ঢোলের গড়ন সেই জিনিসটা সত্যি মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরি কি না, এটাও জানা উচিত।

চণ্ডীমাইজির থানের কাছাকাছি গিয়ে বাইনোকুলারে খুঁটিয়ে চারদিক দেখে নিলাম। বিকেল ঘনিয়ে এসেছে। কোথাও মানুষজন নেই। চণ্ডীমাইজির থান সম্পর্কে লোকের মনে সশ্রদ্ধ আতঙ্ক থাকাই স্বাভাবিক। আমি নদীর দিকে ঘুরে থানে ঢোকার পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। থান জনহীন। কী একটা অস্বস্তি এক সেকেন্ডের জন্য আমাকে ছুঁয়ে গেল। মড়ার খুলিগুলো সরিয়ে, তখনও ছায়া গাঢ় হয়নি, আতস কাচের সাহায্যে আবিষ্কার করলাম, চণ্ডীমাইজির জিভের তলায় ইঞ্চি চার-পাঁচ অংশ তলার তিনকোনা প্রকাণ্ড পাথরের সঙ্গে আটকে আছে। রহস্যটা ফাঁস হলো। যে এটা গড়েছিল, এটা তারই চাতুর্য। তাকে প্রকাণ্ড একটা পাথর খোদাই করে এই ভাস্কর্যটা গড়তে হয়েছিল।

এবার ছুরি বের করে মানুষের চামড়ায় তৈরি ঢোলের মতো জিনিসটা তুলে নিলাম। দু'দিকটা খোলা ঢোল থেকে আমাকে চমকে দিয়ে একটা কাগজের মোড়ক বেরিয়ে নিচে পড়ল। তখনই ঢোলটা রেখে উঠে দাঁড়ালাম। স্যাটার্নদেবই বটে।

নদীর ধারে সকালে যেখানে একটা পাথরে বসে শিকারি বাজপাখির ছবি তুলেছিলাম, সেখানে গিয়ে চুরুট ধরালাম। কালো রঙের দুটো গার্ডারে কাগজের মোড়কটা আটকানো ছিল। ছ ইঞ্চি লম্বা এবং চার ইঞ্চি চওড়া। একদিক খুলে দেখে নিলাম, আমার ভুল হয়েছে কিনা।

নাঃ। আমার ভুল হওয়ার কথা নয়। বিপ্লব চণ্ডীর থানে মানুষের চামড়ায় তৈরি ঢোলের কথা জানত। সে এখানকারই ছেলে। এ-ও জানত, ওটা ভুলেও কেউ ছোঁবে না, চণ্ডীর শাপে কুষ্ঠ হবে—এই কথাটাও তার জানা। অতএব সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে স্যাটার্নদেবকে সে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।

বরুণ ভাবতেও পারেনি, তার স্ত্রী স্বাগতার পিছনে গোয়েন্দাগিরির জন্য আপাতদৃষ্টে সরলপ্রকৃতির যে মাসুততো ভাইকে বেডরুমের চাবি দিয়ে গেছে, সে কারও প্ররোচনায় এমন সাংঘাতিক একটা কাজ করে ফেলবে। হ্যাঁ—এসব ক্ষেত্রে জোরালো প্ররোচনা থাকা যুক্তিসিদ্ধ। বোন তানিয়ার বিয়ে এবং নিজের দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা বিপ্লবকে শেষাবধি এই কাজটা করিয়ে নিয়েছিল। পরিচারিকা সৌদামিনীর দুর্মুখ স্বভাবও বিপ্লবের ক্ষোভ ও অভিমানের একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু না—এখন এসব কথা চিন্তার সময় নয়।

কিটব্যাগের তলায় মোড়কটা চালান করে দিয়ে আমি বাইনোকুলারে শিকারি বাজপাখিটাকে খুঁজতে থাকলাম। পাখিটা দেখা দিল না। বিকেলের ফিকে রোদ পশ্চিমের তরঙ্গায়িত রুক্ষ মাঠ পেরিয়ে নদীর ওপারে উঁচু গাছপালার ফাঁক দিয়ে নদীতে পড়েছে। তীব্র স্রোত আর আবর্তের উপর সেই রোদ প্রজাপতির মতো নাচছে। এখানে কোনও প্রজাপতি দেখছি না। ওই অলীক প্রজাপতি কিছুক্ষণ দেখার পর উঠে দাঁড়ালাম। আমার মনে এখন যে প্রশান্তির ভাব, তা সম্ভবত মহাপুরুষদের মনে বাস করে।...

ডাকবাংলোয় ফিরে দেখি, একটি আদিবাসী মেয়ের হাতে মুরগি এবং চৌপটলাল তার সঙ্গে দরাদরি করছে। আমাকে দেখামাত্র মেয়েটি কথা বন্ধ করল। বললাম—বাঃ! ডিনারে আজ মুরগির মাংস পেলে খুশি হব। মেয়েটি কত চাইছে চৌপটলাল?

চৌপটলাল বলল—জি কর্নিলসাব! বিশ রুপৈয়া। গাঁওমে ইয়ে মুর্গা দশ-বারাহ রুপৈয়ামে দিয়ে দেবে। হামি পন্দর রুপৈয়া বলেসে।

প্যান্টের পিছন পকেট থেকে পার্স বের করে দুটো দশ টাকার নোট মেয়েটিকে দিলাম। মেয়েটি দ্রুত চৌকিদারের হাতে মুরগিটি গুঁজে দিয়ে দু'হাত পেতে টাকা নিল এবং আমাকে একটু ঝুঁকে নমো করে চলে গেল। চৌপটলাল হাসতে হাসতে বলল—আচ্ছা মুর্গা আছে হুজুর। রতিয়াকি উপ্পর চণ্ডীমাইজির কিরপা হয়ে গেল।

—শিগগির কফি খাওয়াও চৌপটলাল! গলা শুকিয়ে গেছে।

চৌপটলালের হাতে বধ্য পাখিটি চুপ করে গেছে। আমি মাংসাশী প্রাণী। সামরিক জীবনে সাপের মাংসও কতবার খেয়েছি। এ বিষয়ে আমার কোনও ন্যাকামি নেই। ডারউইন তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী। মানুষের পূর্বপুরুষ এপম্যানরা

তৃণভোজী ছিল না। এখনও অসংখ্য প্রজাতির বানর মাংসাশী।...

কফি পান করার পর চুরুট ধরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। কিটব্যাগটা টেবিলে যেমন রাখি, তেমনই রাখলাম। এখানে মশার উৎপাত তত নেই। আলো জ্বাললে পোকার উপদ্রব আছে, এই যা। চিনা লণ্ঠনটা জ্বেলে টেবিলে রেখে বারান্দায় এসে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে মোটরবাইকে চেপে ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার রাজেশ শর্মা এলেন। নমস্কার করে চেয়ারে বসে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন—কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো কর্নেলসায়েব?

বললাম—না, আনন্দে আছি মিঃ শর্মা। তো শুনলাম আজ—

মিঃ শর্মা আমার কথার উপর বললেন—একটা মার্ডার হয়েছে। আশ্চর্য কর্নেলসায়েব! ছেলেটি—

এবার ওঁর কথার উপর আমি বললাম—সব শুনেছি। আমি ডাক্তার চৌধুরির বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার কী ধারণা তা-ই বলুন! ছেলেটি নাকি কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করত। পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরেই খুন হয়ে গেছে। খুনী তার লাশ জলপ্রপাতে ফেলে দিয়েছিল। ছেলেটির চেনাজানা কেউ খুনী। জলপ্রপাতের ধারে তাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। এটাই আমার ধারণা। আপনার কী মনে হয় বলুন?

রাজেশ শর্মা চাপা স্বরে বললেন—ডাক্তার চৌধুরির একটি মেয়ে আছে। বাঙালিটোলার শচীন্দ্রনাথ সিনহার ছেলে রজতকান্তের সঙ্গে মেয়েটির মেলামেশার কথা সবাই জানে। রজতকান্ত কলেজে রাজনীতি করে। আজকাল রাজনীতি মানেই খুনোখুনি! রজতকে বাঙালিটোলারই অনেকে পছন্দ করে না। ডাক্তার চৌধুরির ছেলে বিলুর সঙ্গে তার বনিবনা নেই। গতবার পুজোর সময় বিলুর সঙ্গে তার মারামারি হয়েছিল। ট্যুরিস্ট লজের বাঙালি কর্মচারী পরেশের কাছে শুনেছি।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—বুঝেছি। বিলু বোনকে রজতের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছিল। এতে রজতের রাগ হওয়ার কথা। কিন্তু বিলুর চেয়ে রজত নিশ্চয় বয়সে ছোট। বিলুকে আমি দেখিনি। কিন্তু তাকে রজত ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খুন করবে? রজত ফায়ার আর্মস কোথায় পাবে?

—এখানে ফায়ার আর্মসের চোরাবাজার আছে। আপনি বিহারের অবস্থা নিশ্চয় জানেন?

চৌপটলাল মিঃ শর্মাকে আসতে দেখেছিল। কফি আনল। আমার কফিরোগ লোকটা বুঝে গেছে। আমার জন্যও আনল। তারপর একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আস্তে বলল—কুঠা আসলাম খাঁ হামাকে বলল, খুনী বাহারকা আদমি। লালচাঁদ ট্রান্সপোর্ট কম্পানি মোটরগাড়ির কারবার করে। পুলিশ উয়ো কম্পানিকি সাথ বাতচিত

করসে। খুনী ডাক্তারবাবুকা লড়কাকা পিছে পিছে আসেছিল। উনহিকো উঠাকে লে গেয়া। মার ডালা।

বুঝলাম, চৌকিদার আমাদের আলোচনা শুনেছে। বললাম—আসলাম খাঁ যদি এ কথা বলে, তাহলে ঠিকই বলেছে। পুলিশ নিশ্চয় কোনও ক্লু পেয়েছে। মিঃ শর্মা কি জানেন, আসলাম পুলিশের চর?

রাজেশ শর্মা হাসলেন—জানি না। আমি লোকটার কথা শুনেছি। সে-ও তো জেলখাটা খুনী। কুষ্ঠ রোগ হয়ে এখন ভিক্ষে করে বেড়ায়। থাক ওসব কথা। আমি জানতে এসেছিলাম, আপনি বার্ড স্যাংচুয়ারি যাবেন কি না। তা হলে কাল মর্নিংয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। কলকাতা থেকে মজুমদার সায়েব ফোন করেছিলেন। আমাদের একটা জিপগাড়ি আছে।

—কালকের দিনটা থাক। কাল আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াটা ঘুরে দেখব।

—সে-ও তো তিন কিলোমিটার দূরে।

—হেঁটে বেড়ানো আমার স্বভাব মিঃ শর্মা। আপনি লক্ষ করে থাকবেন, আমার কাছে প্রজাপতিধরা জাল আছে। রাস্তার পাশে বুনো ফুলের ঝোপে প্রজাপতি হানা দেয়। দৈবাৎ দুর্লভ প্রজাতির একটা প্রজাপতি পেলে জালে ধরতে চেষ্টা করি। না পারলে ক্যামেরায় ধরি।

—আপনার ইচ্ছা! বলে কফি দ্রুত শেষ করে মিঃ শর্মা উঠে দাঁড়ালেন।—চলি তা হলে। জরুরি দরকার হলে চৌপটলালকে দিয়ে খবর পাঠাবেন। নমস্তে।

রাজেশ শর্মা সন্ধ্যার স্তব্ধতা চুরমার করে চলে গেলেন। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানতে টানতে প্রকৃতির রহস্যময় আদিম রূপ, যার নাম অন্ধকার, তাকে দেখতে থাকলাম। দূরে নদীর পশ্চিমপাড়ে শেয়ালের ডাক শোনা গেল। তারপর কাছাকাছি একটা পেঁচা ক্রাঁও ক্র্যাঁও করে বারকতক ডেকে চুপ করল। এবার লক্ষকোটি পোকামাকড়ের অর্কেস্ট্রা কানে ভেসে এল।

শৈবাল ব্যানার্জির সঙ্গে মহাবীর আগরওয়ালের লোক ছিল এতে আমি নিঃসন্দেহ। শৈবাল নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করেছে, এটা সম্ভব। বিপ্লব কি তাকে চণ্ডীর থানে লুকিয়ে রাখা মূর্তিটা দেবে বলেই শেষ রাত্রে ওদের সঙ্গে এসেছিল? তারপর গাড়িটা চণ্ডীর থানের দিকে কাঁচা রাস্তায় না গিয়ে পিচরাস্তার বাঁক দিয়ে এগিয়ে গেল কেন? তারপর হঠাৎ এখানে থেমে গেল কেন?

এবং এ-ও স্পষ্ট, বিপ্লবকে সেখানে নামিয়ে গুলি করা হয়েছিল। গুলি করে তাকে ঝোপের নিচের জলকাদাভরা ঘাসে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর বেগতিক বুঝে গাড়িটা নিচে নামিয়ে এবং ডিকিতে বিপ্লবের লাশ তুলে গাড়িটা নিয়ে যাওয়া হয় প্রপাতগামী কাঁচা রাস্তায়।

কিন্তু শেষ রাত্রে কেন এ ঘটনা ঘটল? কেন মধ্যরাতে ঘটল না?

বিরক্ত হয়ে প্রশ্নগুলো চাপা দিলাম। ঘটনা হয়তো প্রকৃতপক্ষে সহজ, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে গেলে হাজারটা প্রশ্ন এসে গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে দেয়। আমার 'ক্লায়েন্ট' হারানো মূর্তি উদ্ধার করে দিতে অনুরোধ করেছিল এবং আমি তা যেভাবে হোক উদ্ধার করেছি। ব্যস! এখানেই আমার দায়িত্ব শেষ। মূর্তিচোর প্রাণে মারা পড়েছে। তার জন্য আমার মাথা ঘামানোর অর্থ হয় না।

ঘরে ঢুকে আমি লাগেজব্যাগ থেকে জে ডি হুকারের 'এ সেঞ্চুরি অব ইন্ডিয়ান অর্কিড্‌স্' বইটা বের করলাম। চিনা লণ্ঠনটা একটু তফাতে রেখে বইটার পাতা উল্টে মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু টেবিলের কিটব্যাগটা হঠাৎ ব্যালান্স হারিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিল। বিরক্তিকর!

কিটব্যাগটা টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দিলাম। প্রজাপতিধরা জালের স্টিকটা উঁচু হয়ে ছিল। তাই ব্যাগটা পায়ের তলায় শুয়ে রইল।

বইটার পাতা চিনা লণ্ঠনের আলোয় অস্পষ্ট। বৈদ্যুতিক টেবিলল্যাম্পের জোরালো আলোয় বই পড়তে আমি অভ্যস্ত। পোকার উৎপাতও বাড়ছে। অগত্যা বইটা বুজিয়ে রেখে বাইরে গেলাম। কিচেনের দিকে চৌপটলালের চাপা গলায় গানের শব্দ ভেসে আসছে।

এইসময় নদীর ওপারে মোটর গাড়ির জোরালো আলো চোখে পড়ল। একজোড়া আলো পাথরের ব্রিজের ওপর দিয়ে আসছে। গাড়ির গরগর শব্দ শুনে অনুমান করলাম জিপ নয়। নতুন গাড়ি। ঘরে ঢুকেই প্যান্টের পকেট থেকে পয়েন্ট ২২ ক্যালিবারের রিভলভারটার সেফটিক্যাচ ঠেলে তুলে দিলাম। ডান হাত প্যান্টের পকেটে রেখে বাঁ হাতে টর্চ নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। গাড়িটা লনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চৌপটলাল তার কাজ ফেলে দৌড়ে এসেছিল। সে ভরাট গলায় বলল—কৌন জি? শর্মাসাব?

আমাকে প্রচণ্ড বিস্মিত করে এবং অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে শৈবাল ব্যানার্জি বলল—কর্নেলসায়েব! আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

বললাম—আসুন। আসুন মিঃ ব্যানার্জি! এ আমার সৌভাগ্য।

গাড়ি থেকে তার সঙ্গিনীকে নামতে দেখলাম। অস্বস্তি একটু কমল। সঙ্গিনী নিয়ে কেউ গুলির লড়াই লড়তে আসে না। শৈবাল একটু হেসে বলল—বিকেলে জয়শ্রী সিনে স্টুডিয়োর ম্যানেজার গোপাল কুণ্ডুকে ট্রাঙ্ককল করেছিলাম। সে আপনার অনেকদিনের চেনাজানা লোক। কিন্তু সে আপনাকে বলেনি, আমি কোথায় গেছি। এনিওয়ে! ব্যাপারটা আমার বোঝা দরকার। তাই আপনি কোথায় উঠেছেন, সেই খবর নিয়ে চলে এলাম।

—ইউ আর ওয়েলকাম। আসুন। চৌপটলাল! কফি আর কিছু স্ন্যাক্স নিয়ে এস জলদি।

—ধন্যবাদ। কর্নেলসায়েব! কফি খেতে আসিনি। দুটো কথা বলে চলে যাব।

শৈবাল ব্যানার্জির হাতে টর্চ ছিল। সে এবং তার সঙ্গিনী বারান্দার চেয়ারে বসল। আমি চৌপটলালকে বললাম—ঠিক আছে। তুমি নিজের কাজে যাও। হ্যাঁ—ওই বাতিটা এখানে এনে কোথাও রাখো।

চৌপটলাল চিনা লণ্ঠনটা এনে টেবিলে এক কোনার উপর রেখে চলে গেল। বললাম—গোপালবাবুর ঘরে একটা ফিল্মের পোস্টারে আপনার নাম দেখেছিলাম। আমারও ফিল্মের হবি আছে। মুভি ক্যামেরা আছে। তবে আমার সাবজেক্ট হলো নেচার। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল আমার কিছু ছবি কিনেছে।

শৈবাল ব্যানার্জি বলল—গোপাল কুণ্ডু আমাকে বলল, আপনি আমাকে দিয়ে ফিল্ম করাতে চান। আপনার কার্ডে নেচারোলজিস্ট লেখা আছে। আপনি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল। আপনি এখানে কেন এসেছেন জিজ্ঞেস করলে আপনার উত্তর দেওয়া সোজা। বাহারামগড়ের জঙ্গল আছে। জলপ্রপাত আছে। বার্ড স্যাংচুয়ারি আছে। কিন্তু আপনি এখানে কেন এসেছেন তা আমি জেনে গেছি।

—বলুন। আপনার মুখেই শোনা যাক।

বরুণ দত্তরায় আমার অনেকদিনের বন্ধু। ওদের বাড়িতে আমার অবাধ গতিবিধি। কাজেই ও-বাড়িতে আমাকে পছন্দ করে এমন লোক আছে।

—আপনি তাকেও ট্রাঙ্ককল করেছেন?

—হ্যাঁ। বরুণের স্ত্রী স্বাগতা বাহারামগড়ে আসছে শুনলাম। কেন আসছে আমি জানি। আমার 'লোক' তা জানে না। তবে আপনি ও বাড়িতে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন, তা-ও আমি বুঝতে পেরেছি।

নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে ধোঁয়ার মধ্যে বললাম—বিপ্লব ঝগড়াঝাঁটি করে মাসতুতো দাদার বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। সে একটা মহামূল্য মূর্তি চুরি করে এনেছিল—মিসেস দত্তরায়ের এই ধারণা। কিন্তু এখানে এসে শুনলাম তাকে কেউ গুলি করে মেরে প্রপাতে ফেলে দিয়েছে।

শৈবাল ব্যানার্জি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বলল—আমি তাকে গুলি করে মারিনি।

একটু হেসে বললাম—আমি তা বলেছি কি? খুনের মামলা পুলিশের হাতে। আমি এখানে বাইরের লোক। অপরিচিত। আপনি নিশ্চয় খোঁজ নিয়েছেন, আমি পুলিশের কাছে যাইনি। পুলিশ আমাকে চেনেও না।

—আপনি আজ বিকেলে আবার আমার খোঁজে আগরওয়ালজির বাড়িতে

গিয়েছিলেন। কাজেই আমার মনে হলো, আপনার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত।

—কীসের বোঝাপড়া, খুলে বলুন।

—আমি মার্ডারার নই। ফিল্মডাইরেক্টর। বিপ্লব টাকার লোভে কারও ফাঁদে পা দিয়ে মারা পড়েছে। স্বাগতা আর চুরি হওয়া মূর্তিটা ফিরে পাবে না। বরুণ ফিরলে স্বাগতাকে ডিভোর্স করবে, কিংবা পুলিশের হাতে তুলে দেবে। স্বাগতার নামে তার পালকপিতাকে বিষ খাইয়ে মারার কেস এখনও ঝুলে আছে। আই মিন, চাপা দেওয়া আছে। কেউ খুঁচিয়ে দিলেই কেসটা আবার ফাইলের তলা থেকে বেরিয়ে আসবে। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, বরুণ স্বাগতাকে বিশ্বাস করে না। বিপ্লব সেই সুযোগটা নিয়েছিল।

—আপনার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে, তাহলে আমার কথাটা আপনার শোনা উচিত।

শৈবাল একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—বলুন। শোনা যাক।

—মিঃ নাগেশ্বর শেঠ হোটেল এশিয়ায় শুক্রবার রাত্রে একটা পার্টি দিয়েছিলেন। মিঃ শেঠ আমার পুরনো বন্ধু। এনিওয়ে, সেখানেই আমার সঙ্গে স্বাগতার আলাপ করিয়ে দেন তিনি। স্বাগতা আমাকে পরদিন বিকেলে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছিল। জাস্ট ফর্মালিটি। কিন্তু গিয়ে দেখি, স্বাগতার স্বামীর মাসতুতো ভাই বিপ্লব বাড়ি থেকে ঝগড়া করে পালিয়ে গেছে। স্বাগতা পরে জানতে পারে, সে একটা খুব দামি মূর্তি চুরি করেছে। আমি এই অবস্থায় ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যা কিছু করা উচিত, তা-ই করেছি।

—কিন্তু আপনি আমার খোঁজে গোপাল কুণ্ডুর কাছে গিয়েছিলেন কেন?

—আপনার খোঁজে যাইনি। আপনাকে তো বললাম আমি নেচার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি ফিল্ম করি। জয়শ্রীর ল্যাবের সাহায্য আমাকে নিতে হয়। তাই ওখানে মাঝেমাঝে যাই। গোপালবাবু আমুদে লোক। তাঁর ঘরে একটু আড্ডা দিই। দু'-একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনও পড়তে নিয়ে আসি।

শৈবাল ব্যানার্জি চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকল। তার সঙ্গিনী তীক্ষ্ণদৃষ্টে আমাকে দেখছিল। চোখে চোখ পড়ায় সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। বললাম—ইনি কি মিঃ ব্যানার্জির পরবর্তী ছবির হিরোইন?

শৈবাল আস্তে বলল—হুঁ।

হাসতে হাসতে বললাম—দেখুন মিঃ ব্যানার্জি, যদি আমি স্বাগতার কথায় গোয়েন্দাগিরি করতে আসতাম, তা হলে এখানে তাদের বাংলাতেই উঠতাম। এখানে এসে জানতে পেরেছি, ওদের এখানে একটা ফ্যাক্টরি আছে। বাংলোবাড়ি আছে।

কিন্তু আমি এই পুরনো ডাকবাংলোতে উঠেছি। ট্যুরিস্ট লজে ঠাঁই পাইনি। দুটো বড় হোটেল আছে। সেখানে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা এই শস্তা ডাকবাংলোয় উঠেছি। দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে বিদ্যুৎ নেই; প্রচণ্ড মশার উৎপাত। রাত্রে বেশ গরম পড়ে।

শৈবাল ব্যানার্জি উঠে দাঁড়াল। আমি সতর্কভাবে ডান হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকালাম। কিন্তু শৈবাল বলল—চলি। কিছু মনে করবেন না।

তার সঙ্গিনীও উঠল। বললাম—একটা কথা মিঃ ব্যানার্জি। নিছক কৌতূহল। মূর্তিচোর বিপ্লবের প্রতি আমার কোনও সহানুভূতি নেই। তবু জানতে চাইছি, বিপ্লব আপনাকে নিশ্চয় চিনত। হ্যাঁ—ও-বাড়ি আপনি যেতেন। কাজেই বিপ্লব আপনাকে অবশ্যই চিনত। তো বাই এনি চান্স, সে কি গতরাত্রে আগরওয়ালসায়েবের বাড়িতে আপনার কাছে গিয়েছিল?

—না। আমি এখানে এসেছি, তা ওর জানার কথা নয়।

—আর একটা কথা। এ-ও নিছক কৌতূহল। মিঃ আগরওয়াল কি আপনার পরবর্তী ফিল্মের ফাইন্যান্সার?

—হ্যাঁ। বলে সিগারেটটা জুতোর তলায় ঘষে নিভিয়ে শৈবাল ব্যানার্জি গাড়িতে উঠল। অন্যদিকের দরজা দিয়ে তার সঙ্গিনী উঠল। তারপর গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে আমাকে এবং পুরনো শ্রীহীন বাংলোটাকে একঝলক তীব্র আলোয় ঝলসে দিয়ে ব্রিজের দিকে নেমে গেল।

শৈবাল ব্যানার্জি নিজেই গাড়িটা চালিয়ে এনেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত। সে কি আমাকে বাজিয়ে দেখতে এসেছিল? তা হলে তো এটা 'ঠাকুরঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি'—গোছের ব্যাপার হয়ে গেল।

কিংবা সে সত্যিই নির্দোষ। মহাবীর আগরওয়ালের সঙ্গে বিপ্লবের পরিচয় থাকতেই পারে। আগরওয়ালকে সে মূর্তিটা বেচতে চেয়েছিল। শৈবাল ব্যানার্জির অজ্ঞাতসারে বিপ্লব আগরওয়ালের ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণ হারায়। তাকে গুলি করে মারার পর আগরওয়াল তার কাছে কোনও মূর্তি পায়নি। তাই শৈবাল ব্যানার্জিকে ডেকে এনে তাঁর কাঁধেই লাশ কোথাও লুকিয়ে ফেলার মহৎ দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। শৈবালের ছবির টাকা যে দেবে, শৈবাল তার কথা মানতে বাধ্য হয়েছিল।

আমার এই থিয়োরিটা এবার লাগসই মনে হলো। কিন্তু একটু খটকা থেকেই গেল। শেষ রাত্রে বিপ্লবকে পিচারাস্তার ধারে মারা পড়তে হলো কেন? কেন শেষরাত্রে—অন্তত ভোর পাঁচটার একটু আগে বা পরে?

রাত সাড়ে নটায় খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে চুরুট টানলাম। আধঘণ্টা পরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। তারপর দক্ষিণ ও পূর্বের দুটো জানালাই

বন্ধ করে কিটব্যাগটা থেকে কাগজের মোড়কটা বের করলাম। লণ্ঠনের আলোয় কালো গার্ডার জড়ানো মোড়ক পুরো খুলে দেখলাম, স্যাটার্নদেবের তলায় তিনটে চিঠি। তিনটেই খামে ভরে বিপ্লবের নামে ডাকে পাঠানো হয়েছিল।

একটা খাম থেকে বেরুল ছোট্ট একটা চিঠি। সাদা কাগজে ইংরেজিতে লেখা চিঠি। তলায় সইটা অস্পষ্ট। তারিখ ২/৬। সাল লেখা নেই। দ্বিতীয়টাও একই হাতের লেখা চিঠি। একই সই। তারিখ ৭/৮। তৃতীয় চিঠিটাও একই হাতের লেখা। একই সই। তারিখ ৪/১০। তাহলে গত সপ্তাহে লেখা।

৪ অক্টোবর লেখা চিঠিটাতে ভোরে বিপ্লব মারা পড়ল কেন, তার স্পষ্ট উত্তর আছে। যে চিঠি লিখেছে, তার বক্তব্য, এসব কাজ রাত্রে হলে নিরাপদ হয়। চিঠির লেখকের পিছনে পুলিশের লোকেরা সবসময় নজর রেখে চলছে। তবে বিপ্লব যখন চাইছে, টাকাকড়ি সে দিনের আলোতে গুনে নেবে, তখন তাই হবে। তবে তার বাড়িতে যাওয়ার অসুবিধে আছে। প্রাতঃভ্রমণে যাওয়ার ছলে চিঠির লেখক যাবে। বিপ্লব কোথায় থাকবে, তা যেন বাড়ি ফিরে ফোনে জানিয়ে দেয়।...

বিপ্লব টাকার লোভেই মূর্তিটা চুরি করেছিল। কিন্তু সে বুদ্ধিমান। মূর্তির তলায় চিঠি তিনটে রেখে চণ্ডীর থানে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল, যেখানে কেউ হাত দেবে না। টাকা পেলে সে লোকটাকে চণ্ডীর থানে নিয়ে গিয়ে মূর্তিটা দিত। চিঠি তিনটে লুকিয়ে ফেলত। দৈবাৎ যদি অন্য কিছু ঘটে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা সে করেছিল। কিন্তু চিঠির লেখক সেই ক্রেতা লোকটি কত সাংঘাতিক, তা আঁচ করতে ততটা পারেনি বিপ্লব। লোকটা ভেবেছিল, বিপ্লবের কাছেই মূর্তি আছে। অতএব তার বুকে গুলি করে মেরে তার পোশাক হাতড়ে মূর্তি পায়নি সে। অগত্যা নিষ্ফল ক্রোধে ক্ষিপ্ত ঘাতক বিপ্লবের লাশ প্রপাতের জলে ফেলতে গিয়েছিল।

জীবনে যা-কিছুই ঘটুক, আমি দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ি এবং জয়ন্তের কাছে শুনেছি, আমার নাক জেগে থাকে। তা কী আর করা যাবে?

ভোর ছটায় পিঠে কিটব্যাগ সেঁটে বাইনোকুলার-ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আজ প্রপাতের দিকে না গিয়ে পিচরাস্তা ধরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হেঁটে গেলাম। যাবার সময় বিপ্লবের লাশ পড়ে থাকা জায়গাটায় একবার তাকিয়েছিলাম। পুলিশ নিশ্চয় জায়গাটা দেখে গেছে।

পিচারাস্তাটা শালবনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। আধ কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তা পূর্বে বাঁক নিল। বাঁকের মুখে একটু দাঁড়িয়ে আর হাঁটব কি না ভাবছি এবং বাইনোকুলারে রাস্তার দুটো দিকই দেখে নিচ্ছি, এমন সময়ে চোখে পড়ল একটা

লাল মারুতি ভ্যান এগিয়ে আসছে। ইনট্যুইশন। আমি দ্রুত বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। শালগাছের তলায় ঘন ঝোপঝাড়। এঁকে-বেঁকে যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে দেখি, কাল যে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে হেঁটে গিয়েছিলাম, এটা সেই তরঙ্গায়িত মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত। অদূরে কয়েকটা গাছের জটলা এবং প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই লক্ষ করে এগিয়ে গেলাম। পাথরের আড়ালে বসে বাইনোকুলারে জঙ্গলের দিকে লক্ষ রাখলাম।

কিছুক্ষণ পরে গুঁড়ি মেরে উত্তরে আরও একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে গিয়ে বসলাম। কিন্তু জঙ্গল থেকে কোনও আততায়ীকে বেরুতে দেখলাম না।

এইভাবে ঝোপঝাড়, নালা আর পাথরের আড়াল দিয়ে ক্রমে বাঙালিটোলার পিছনে গিয়ে পৌঁছুলাম। এতক্ষণে সূর্য উঠেছে। পিছু না ফিরে আমি বাঙালিটোলার একটা বাড়ির পিছন ঘুরে ঝোপঝাড়ে ঢাকা পোড়ো জমি পেরিয়ে পিচের রাস্তাটা পেয়ে গেলাম। তারপর কিছুটা এগিয়েই একটা খালি সাইকেলরিকশো পেয়ে গেলাম। লোকটা সদ্য তার বাড়ি থেকে রিকশো নিয়ে বেরুচ্ছিল। আমাকে পেয়ে সে খুবই খুশি হলো।

ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে রাজেশ শর্মার খোঁজ করলাম। রিসেপশন কাউন্টারের প্রকাশ নামে যুবকটি আমাকে চিনতে পেরে ম্যানেজারের ঘরে বসাল। বলল—শর্মাসায়েব আধঘন্টার মধ্যে এসে পড়বেন।

একটু পরে কফি আর স্ন্যাক্স এল। কফি আমার শরীরকে দ্রুত চাঙ্গা করে তুলল। একটা অসম গুলির লড়াই থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। অন্তত দুজন আততায়ীর লাশ না ফেলে আমি নিজে লাশ হতাম না। জঙ্গলে সামরিক জীবনে শেখা গেরিলাযুদ্ধের কৌশল কাজে লাগানোর সুযোগ আবার এসেছিল। কিন্তু এখন আমি বৃদ্ধ। সেই মনোবল আছে কিনা তার ভরসা নেই। তাই ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না।

চোখ বুজে চুরুট টানছিলাম। রাজেশ শর্মার সম্ভাষণে চোখ খুললাম।—মর্নিং কর্নেলসায়েব।

—মর্নিং মিঃ শর্মা।

—আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য?

—আপনাদের জিপ গাড়িটা পেলে সুবিধে হয়।

—অবশ্যই পাবেন। এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—তার আগে থানায় একটা টেলিফোন করতে চাই।

—করুন।

রিসিভার তুলে ডায়াল করছি দেখে মিঃ শর্মা অবাক হয়ে বললেন—আপনি

নাম্বার জানেন?

—আমি কোথাও গেলে সবার আগে থানার নাম্বার জেনে যাই। অবশ্য আপনাদের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের লিটারেচারে থানার নাম্বারও দেওয়া থাকে।

মিঃ শর্মা হাসলেন—তা ঠিক।

সাড়া এলে মৃদুস্বরে বললাম—অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আপনি কে বলছেন?

—আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—ওসিকে আধঘণ্টা পরে পাবেন স্যার।

—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। আপনাদের ওখানেই অপেক্ষা করব। ধন্যবাদ।...

কিছুক্ষণ পরে মিঃ শর্মা লনে নিয়ে গেলেন। উর্দিপরা ড্রাইভার আমাকে যে-ভঙ্গিতে সেলাম দিল, বুঝলাম সে সামরিক বাহিনীতে ছিল। মিঃ শর্মার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে একটু হেসে বললাম—তেমন কিছু নয়। পরে যথাসময়ে সব জানতে পারবেন।...

কলকাতা থেকে যখনই বাইরে কোথাও যাই, তখন এই জরুরি কাজটা আমি করে নিই। ছোটনাগপুর এলাকার ডি আই জি সুরেশ সিংহ আমার চেনা পুলিশ অফিসার। এদিকে কোথাও এলে ট্রাঙ্ককলে (এ ঘটনা যখনকার, তখনও ফোনে এস টি ডি পদ্ধতি চালু হয়নি) তাঁকে জানিয়ে তবে আসি। এবারও তাই করেছিলাম। তাঁর কাছেই জেনে নিয়েছিলাম, ও সি-র নাম রণবীর ত্রিবেদী। কিন্তু সর্বত্র দেখেছি, স্থানীয় পুলিশ আমার খোঁজ নিয়ে আগেই যোগাযোগ করে। কাল সারাদিন কোনও পুলিশ অফিসার আমার সঙ্গে যোগাযোগ কেন করেনি, জানি না। এখন জানা যেতে পারে।

নিউ টাউনশিপ আর পুরনো বসতির মাঝামাঝি জায়গায় বাহারামগড় পুলিশস্টেশন। অনেকটা জায়গা নিয়ে পুলিশস্টেশন গড়া হয়েছে। দুধারে একতলা কোয়ার্টার। মধ্যে প্রশস্ত লন। দু'ধারে কেয়ারি করা ঝোপ এবং ফুলবাগান। ড্রাইভার আব্দুল করিম কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতরে স্থলবাহিনীতে ড্রাইভার ছিল। দুর্ঘটনায় তার উরুতে আঘাত লাগার ফলে এক বছর তাকে সামরিক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। তারপর তাকে স্বেচ্ছা অবসরের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। দু'বছর পরে ট্যুরিস্ট লজে সে ড্রাইভারের চাকরি পেয়েছে।

পথে তার জীবনকাহিনী আমাকে শুনতেই হয়েছিল। থানার প্রাঙ্গণে জিপ দাঁড় করিয়ে সে পার্কিং জোন দেখিয়ে বলল, সে ওখানে অপেক্ষা করবে।

আমি দরজার ভিতর ঢুকতেই একজন তাগড়াই চেহারার পুলিশ অফিসার আমাকে স্যালুট ঠুকে বললেন—প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কর্নেল সরকার। ডি

আই জি মিঃ সিংহ আমাকে রেডিয়োমেসেজে আপনার কথা জানিয়েছিলেন, কিন্তু কাল জাফরাবাদে জমি নিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমাকে ফোর্স নিয়ে রাত্রি অবধি থাকতে হয়েছিল। আমি আপনার কথা জানিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু নটা মানুষ জাফরাবাদে মারা পড়েছে, তাই আপনার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কথা বলতে বলতে ও সি রণবীর ত্রিবেদী তাঁর ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। তারপর একজন সেপাইকে ডেকে কফি আনতে বললেন। আমি বললাম—আমার নিজের কোনও দরকারে আসিনি মিঃ ত্রিবেদী। গতকাল বাঙালিটোলার এক যুবকের লাশ দুধিয়াসরে পাওয়া গেছে। সেই ঘটনা সম্পর্কে আমি কথা বলতে এসেছি।

মিঃ ত্রিবেদী একটু অবাক হয়ে বললেন—এক মিনিট! আমি এই কেসের আই ও-কে খবর দিই।

—তার আগে আমার কথা আপনার শোনা দরকার।

—বলুন কর্নেল সরকার। আমাদের পক্ষ থেকে যা করার সবই করা হবে।

কলকাতার বরুণ দত্তরায় মিঃ ত্রিবেদীর পরিচিত। এতে অবাক হলাম না। কারণ এই এলাকায় তাঁর ফ্যাক্টরি এবং বাংলো আছে। বরুণ তার বাংলোয় কতবার পার্টির আয়োজন করেছে। আমি আগাগোড়া যা কিছু ঘটেছে, বহুমূল্য মূর্তি চুরি থেকে আজ ভোরে লাল মারুতির মারমুখী পশ্চাদ্ধাবন পর্যন্ত সবটাই খুলে বললাম। শুধু আমার মূর্তি উদ্ধারের কথা জানালাম না। চিঠি তিনটে কলকাতায় বিপ্লবের ঘরে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম—এই ব্যাখ্যাটা দিতে হলো।

রণবীর ত্রিবেদী সব শোনার পর বললেন—অ্যামবাসাডারের কথা আমার অফিসাররা নিজস্ব সোর্স থেকে জেনেছেন। গাড়িটার নাম্বারও পেলাম। দেখুন আমি কী করি। মহাবীর আগরওয়ালের রাজনৈতিক গার্জেন আছে। আমি তা গ্রাহ্য করি না। চিঠি তিনটের হাতের লেখাই যথেষ্ট প্রমাণ।

আবার কফি খেতে হলো। তারপর বললাম—আপনাদের অ্যাকশনের সময় আমি উপস্থিত থাকতে চাই না। কিন্তু আর এক মুহূর্তে দেরি করা উচিত হবে না। আপনি আমার থিয়োরিটা শুনে নিন। আগের রাত্রে বাঙালিটোলায় মহাবীর আগরওয়ালের বাড়িতে শৈবাল ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল বিপ্লব। শৈবাল ব্যানার্জিও তার সঙ্গে মূর্তিচুরির চক্রান্তে জড়িত ছিল। বিপ্লবকে সে মদ খাইয়ে মাতাল করে ফেলেছিল। সম্ভবত মধ্যরাতে নেশা কেটে গেলে বিপ্লব বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু সে বাড়ি ফেরেনি। কারণ তার মুখে মদের গন্ধ ছিল। সে রাত্রি কাটায় বাঙালিটোলারই কারও বাড়িতে। সেই বাড়িটা খুঁজে বের করুন। সেখান থেকে সে খুব ভোরে আগরওয়ালের কথামতো পিচরাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল। আগরওয়াল আর শৈবাল ব্যানার্জি সেখানে যায়। জায়গাটা আপনার অফিসাররা

শনাক্ত করেছেন।

—তার মানে, সেখানেই তাকে গুলি করা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। গুলি করে আগরওয়াল। শৈবাল ব্যানার্জির কথায় বুঝেছি, বিপ্লবকে অতর্কিতে গুলি করে মেরে মূর্তি হাতানোর চেষ্টা আগরওয়াল করবে, তা শৈবাল আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু তারপর আগরওয়ালের কথা তাকে মেনে চলতে হয়েছিল। দুর্লভ মূর্তি হাতানোর শর্তে আগরওয়াল শৈবালকে ফিল্ম করতে টাকা যোগানোর চক্রান্তে ছিল। গাড়িতে কোনও ড্রাইভার ছিল না—এটা আমার অনুমান। আগরওয়াল রিস্ক নেয়নি। সে কিংবা শৈবাল গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল। তারপর গাড়িটা নিচে ঢালু জায়গা দিয়ে নামিয়ে ডিকিতে দুজনেই লাশটা ভরে এবং কোনো পথে জলপ্রপাতে ফেলে আসে। গাড়ির ডিকি ধুয়ে বাড়ি ফিরে যায়। শৈবালের এখনও থেকে যাওয়ার কারণ মূর্তিটা বিপ্লব কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তা খুঁজে বের সে করবেই। আমার ধারণা, আজ সে বিপ্লবদের বাড়ি যাবে। নিজের পরিচয় এবং বিপ্লবের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলবে। এনিওয়ে! উইশ ইউ গুড লাক!

—আপনি উঠেছেন কোথায়?

—পুরনো ডাকবাংলোতে।

—ওটা তো বাঙালিটোলার কাছাকাছি?

—হ্যাঁ। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।...

থানা থেকে বেরিয়ে নিউ টাউনশিপ এরিয়ায় বরুণ দত্তরায়ের বাংলোর খোঁজে চললাম। ড্রাইভার আব্দুল করিম সেই বাংলোটা চেনে না। রাস্তায় থেকে জিজ্ঞেস করতে করতে একসময় খোঁজ পাওয়া গেল। একটা টিলার গায়ে সুন্দর ছবির মতো একতলা ইউরোপীয় ধাঁচের বাড়ি। রঙিন টালির চাল। বাইনোকুলারে দেখলাম, লনে একটা গাড়ি দাঁড় করানো আছে। স্বাগতা ওই গাড়িতেই কি এসেছে?

ঘড়ি দেখলাম পৌনে নটা বাজে। এলাকায় বিত্তবানদের সুদৃশ্য বাংলোধাঁচের বাড়ি। লোকজন চলাচল কম। বরুণের বাংলোর সামনে যেতেই দারোয়ান জানতে চাইল, আমরা কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আমি জিপ থেকে নেমে দাঁড়ানোর একটু পরে স্বাগতাকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তার নির্দেশে দারোয়ান গেট খুলে দিল।

সহাস্যে বললাম—সুপ্রভাত ডার্লিং।

স্বাগতা আস্তে বলল—সুপ্রভাত।

—তুমি কখন পৌঁছেছ?

-আধঘণ্টা আগে।

—এই গাড়িতে এসেছ নাকি?

—না। রাতের ট্রেনে আসানসোল। তারপর বাসে এখানে এসেছি। বাসস্ট্যান্ডে আমাদের ফ্যাক্টরির ম্যানেজারকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।

বলে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা টাইস্যুট পরা এক ভদ্রলোককে বলল—মিঃ মৈত্র! আপনি এবার ফ্যাক্টরিতে চলে যান। একটা গাড়ির দরকার হবে।

ম্যানেজার মিঃ মৈত্র বললেন—এই গাড়িটাই থাক। আপনি তো এটা ড্রাইভ করেছেন। আমি বাড়ি হয়ে ফ্যাক্টরতে যাচ্ছি। নিচের রাস্তায় একটা অটোরিকশো ধরে নেব।

ভদ্রলোক আমাকে দেখতে দেখতে চলে গেলেন। স্বাগতাকে অনুসরণ করলাম। ড্রয়িংরুমে আমাকে বসিয়ে সে বলল—আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কফি আনছি।

—নাঃ। ট্যুরিস্ট লজে এবং পুলিশস্টেশনে দু'বার কফি খেয়েছি। বসো। কথা আছে।

—আপনি আজ আমার গেস্ট। ব্রেকফাস্ট বলে আসি।

—পরে হবে। তুমি বসো।

স্বাগতা বসে আস্তে শ্বাস ছেড়ে বলল—হতভাগা ছেলেটা খুন হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছি না কিছু।

—বুঝিয়ে দেব'খন। তুমি আমাকে স্যাটার্নদেবকে উদ্ধারের দায়িত্ব দিয়েছিলে।

স্বাগতা দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলল—বিপ্লব মারা গেছে। মূর্তিটা আর ফিরে পাওয়ার কোনও চান্স নেই। আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

একটু হেসে বললাম—আগে তুমি স্যাটার্নদেবকে কোথাও লুকিয়ে রাখো।

আমি কিটব্যাগ পিঠ থেকে খুলে সেন্টার টেবিলে রেখে চেন টানলাম। স্বাগতা বিস্মিত এবং বিহ্বল দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ভিতর থেকে কাগজের মোড়কটা তার হাতে দিয়ে বললাম—জীবনে আমার ব্যর্থতার অনুপাত এক শতাংশ। তবে এবারকার সাফল্য সম্ভবত চণ্ডীমাইজির করুণায়। তোমাকে বলা দরকার, এই চণ্ডীদেবী কিন্তু প্রাচীন যুগের একটি বনচর নৃগোষ্ঠীর আরাধ্য দেবী চণ্ডী। চাণ্ডীও বলা হতো। এই দেবীর তথাকথিত 'এরিয়ানাইজেশন'—অবশ্য সমাজ-নৃতাত্ত্বিকরা বলেন 'স্যাংস্কৃটাইজেশন' হয়েছে মধ্যযুগে।

স্বাগতা গার্ডার দ্রুত খুলে মোড়কের ভিতর মূর্তিটা দেখে নিয়েই ছলছল চোখে বলল—জানি না, কী দিয়ে আপনার ঋণ শোধ করব!

—ঋণের প্রশ্ন নেই। স্বাগতা! তুমি মূর্তিটা শীগগির লুকিয়ে রেখে এসো।

স্বাগতা ভিতরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে আমার পা ছুঁতে ঝুঁকল। বাধা দিয়ে বললাম—এটা আমার হবি। দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির অর্কিড সংগ্রহের মতোই এটা

নিছক হবি। যাই হোক, তুমি কি বিপ্লবদের বাড়িতে যাবে?

—একবার যেতেই হবে। বিপ্লব যা-ই করুক, তার মা বরুণের মাসি।...

কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে সংক্ষেপে ঘটনাটা স্বাগতাকে বললাম। শোনার পর স্বাগতা রুষ্টমুখে বলল—শৈবাল একটা স্কাউন্ড্রেল। আমি জানতাম, সে নাগেশ্বর শেঠকে ব্ল্যাকমেল করে। তবু তাকে একটু-আধটু প্রশ্রয় দিতাম। বরুণকে সে মিঃ শেঠের কাছ থেকে তিন লাখ টাকা ধার পাইয়ে দিয়েছিল। বরুণ তা শোধ করেনি। কিন্তু এখানকার ফ্যাক্টরি আমার নামে আছে। আমি সুদসহ সব টাকা মিঃ শেঠকে ফিরিয়ে দেব। মিঃ শেঠ আপনার বন্ধু। তাকে একথা আপনিই জানিয়ে দেবেন।

একটু হেসে বললাম—মিঃ শেঠ তোমাকে ভয় করেন কেন?

—শৈবাল ব্যানার্জির সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে, সে জানে।

—এখনও কি সেই সম্পর্ক থাকবে?

স্বাগতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—কর্নেলসায়েব! বিপ্লবের খুনের মামলায় সে ফেঁসে গেছে। আপনার কথা শুনে মনে হলো, এতক্ষণ তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। আমি তাকে আরও ফাঁসাব। কলকাতায় ফিরে যেতে দিন। তার একটা ফিল্মের প্রোডিউসারের কুড়ি লাখ টাকা আত্মসাৎ করে সে আর একটা ফিল্ম নিজে করেছিল। আমি সেই প্রোডিউসারকে তার বিরুদ্ধে কেস করতে বলব। অসংখ্য মিথ্যা ভাউচার সে আমাকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিল।

—আমি উঠি। ট্যুরিস্ট লজের জিপ নিয়ে এসেছি।

স্বাগতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ড্রাইভারকে বলে দিন জিপের দরকার নেই। আমার গাড়িতে আপনি ফিরবেন।

একটু ভেবে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। আব্দুল করিমকে কুড়ি টাকা বখশিশ দিয়ে বিদায় দিলাম। তারপর ড্রয়িংরুমে ফিরে টেলিফোনের রিসিভার তুলে থানায় ডায়াল করলাম। সাড়া এলে বললাম—ও সি মিঃ ত্রিবেদী আছেন কি?

—আপনি কে বলছেন স্যার?

—আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—নমস্কার স্যার! ও সি সায়েব আমাকে বলে গেছেন, আপনি ফোন করলে যেন জানিয়ে দিই, তিনি একটা অপারেশনে বেরিয়েছেন। আপনার সঙ্গে উনি ডাকবাংলোয় যথাসময়ে দেখা করবেন।

—ধন্যবাদ।...

সেবার বাহারামগড়ে গিয়ে প্রাচীন রোমান শস্যদেব 'স্যাটার্ন'-এর মূর্তি উদ্ধারকে আমি নিজের বড় একটা কৃতিত্ব বলে মনে করিনি। তবে বিপ্লবকে হত্যার

ঘটনাসংক্রান্ত আমার সর্বশেষ থিয়োরির মধ্যে ত্রুটি ছিল না—এটাই আমার প্রকৃত কৃতিত্ব। মহাবীর আগরওয়ালের বাড়িতে সে-রাত্রে বিপ্লব ছিল এবং আগরওয়ালের সঙ্গে নেশার ঘোরে মূর্তিটা নিয়ে দরাদরি করে উঠতে পারেনি। শৈবালের সঙ্গিনী যুবতী রমলা পুলিশের জেরায় একথা স্বীকার করেছিল। এরপর রাত বারোটা নাগাদ বিপ্লব তার এক বাঙালিটোলার বন্ধু সাত্যকি সেনের বাড়িতে যায়। সাত্যকির সাক্ষ্যে জানা গিয়েছিল, সে তার বাড়ি থেকে আগরওয়ালকে ফোন করে। সাত্যকি তার কথা থেকে এটুকু বুঝেছিল, ভোর পাঁচটায় সে 'জিনিসটা' নিয়ে বাঙালিটোলার দক্ষিণে পিচরাস্তার ধারে পিপুলগাছের তলায় অপেক্ষা করবে। সে সাত্যকিকে টেবিলক্লকে সাড়ে চারটেতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে বলেছিল। সাত্যকি তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কারণ আগরওয়াল সাংঘাতিক লোক। বিপ্লব সাত্যকিকে বলে গিয়েছিল, যথাসময়ে সে তাকে সব কথা খুলে বলবে। সাত্যকি একটু ভিতু ও নিরীহ প্রকৃতির যুবক। সে বাজারে মিউজিক্যাল ক্যাসেটের ব্যবসা করে। তাই ঃ মেলা এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু মহাবীর এবং রমলাসহ শৈবাল ব্যানার্জিকে পুলিশ অ্যারেস্ট করার পর গোপনে বিপ্লবের বোন তানিয়াকে কথাটা সাত্যকি জানিয়েছিল। তানিয়া পুলিশকে সে-কথা বলে দেয়। ফলে সাত্যকিকে পুলিশ জেরা করে। আমার অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়।

কুঠো আসলাম খাঁ জলপ্রপাতের কাছে যা ঘটেছিল, তা পুরোটাই দেখেছিল। পুলিশ আমারও স্টেটমেন্ট নিয়েছিল। বিকেলে স্বাগতা বিপ্লবদের বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ও সি মিঃ ত্রিবেদী আমার সঙ্গে বাংলোতে দেখা করে এবং স্টেটমেন্ট নিয়ে চলে যাওয়ার পর চৌপটলালকে বিপ্লবদের বাড়ি পাঠিয়েছিলাম। স্বাগতা কিছুক্ষণ পরে এসে মারুতি গাড়িতে চাপিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। চৌপটলালের হিসেবে ডাকবাংলোর ভাড়া আর তার কাজের দরুন প্রাপ্য ছিল একশো টাকা। আমি পার্স বের করার আগেই স্বাগতা তাকে একশো টাকা দিয়েছিল। আমি বখশিশ হিসেবে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলাম। চৌপটলাল খুশি হয়ে স্যালুট ঠুকেছিল।

স্বাগতার বাংলোয় পরের দিনটা কাটিয়ে এবং তাকে নিয়ে বার্ড স্যাংচুয়ারি দেখে তার সঙ্গে কলকাতা ফিরেছিলাম। স্বাগতার একজন প্রহরীর দরকার ছিল। কারণ আগরওয়ালের পোষ্য একটা দুর্বৃত্তদল আছে। তবে এই অভিযানে আমার নেট লাভ প্রাগৈতিহাসিক একটি আশ্চর্য ভাস্কর্য দর্শন।